দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৫ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ২০ মার্চ, ২০২৩।। ৫ চৈত্র - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

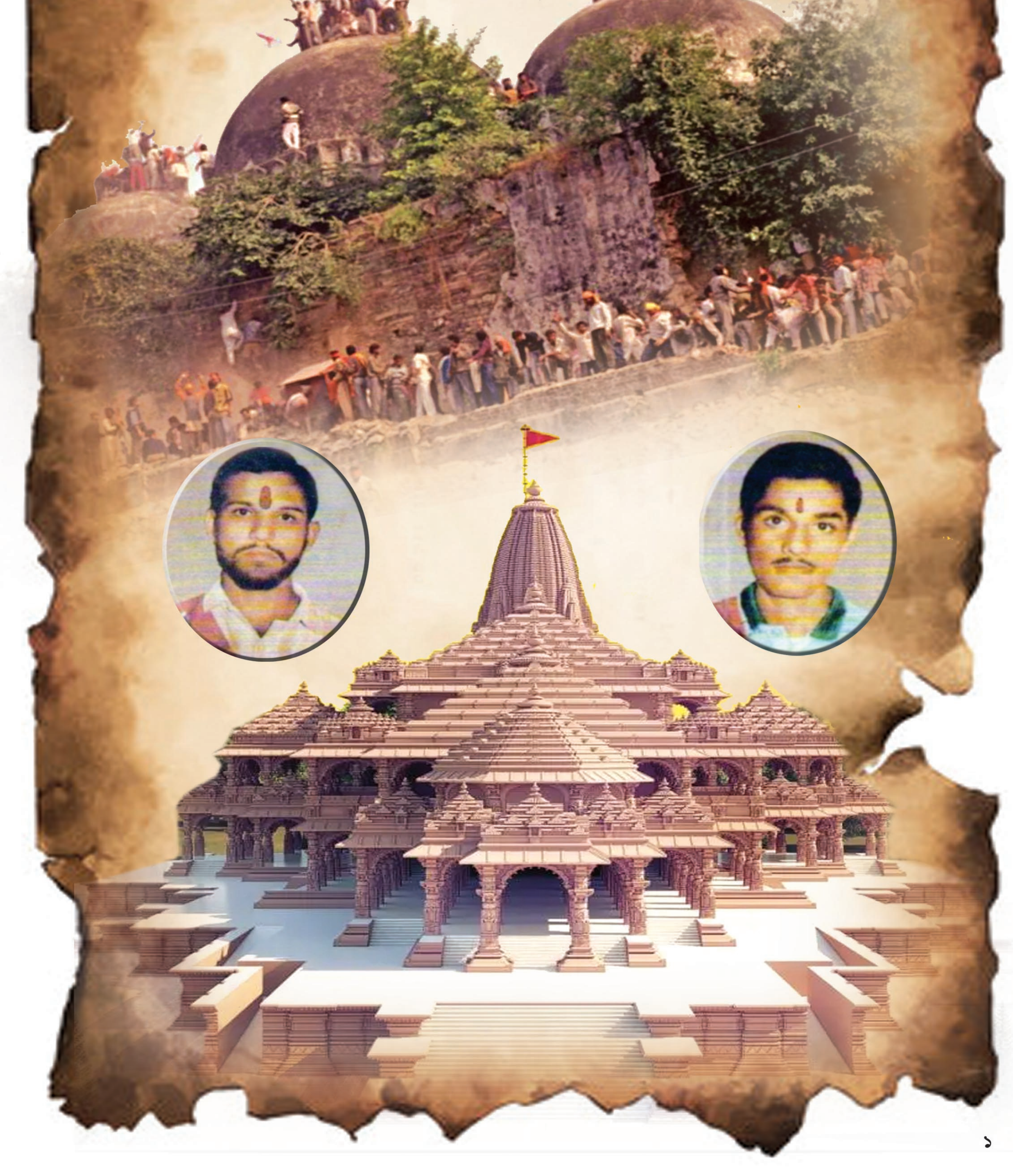

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD

HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ৫ চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২০ মার্চ - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,
Website : www.eswastika.com

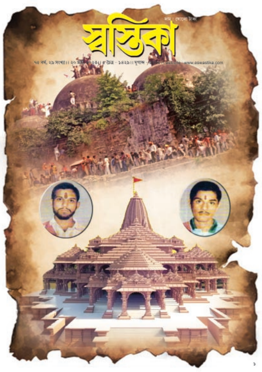

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

মমতা কি গবেট? লোভীবুদ্ধিরা মরীচিকাকে জলই ভাবেন ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দুধেল গাইয়ের লাথি, বড্ড ব্যথা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

কর্ণাটকের রাজা ও রাজা তৈরির কারিগররা ◻ সন্দীপ শাস্ত্রী ◻ ৮

পাকসেনার খাদ্যে টান : তবুও চীনকে সহযোগী করে ভারতের সর্বনাশের দিনেও ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত পাকিস্তান ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

পশ্চিমবঙ্গের হাল দেখে শিক্ষা নিয়েছে ত্রিপুরা ◻ চন্দ্রভানু ঘোষাল ◻ ১১

বিদ্যাসাগর রামমোহনের স্বপ্নের শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে মাত্র অর্ধশতকেই শেষ হয়ে গেল? ◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ১৩

নোটবাতিলে দেশের অর্থনীতি দুর্নীতিহীন হয়ে বেগবান ও প্রাণবন্ত হচ্ছে ◻ ড. বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৫

তিন রাজ্যের নির্বাচনে মুখ পুড়ল তৃণমূল কংগ্রেসের ◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ১৮

মুক্তির মন্দিরে সোপানতলে ◻ ড. জিষ্ণু বসু ◻ ২৩

বাংলার বলিদানী পরম্পরার উজ্জ্বল উদাহরণ রাম কোঠারী ও শরদ কোঠারী ◻ অশোক সিংঘল ◻ ২৫

রামজন্মভূমি মন্দিরের চূড়ায় বাংলার কোঠারী ভাইয়েরাই প্রথম গেরুয়া পতাকা উড়িয়েছিলেন ◻ ২৬

সাক্ষাৎকার : কোঠারী ভাইদের আত্মত্যাগ ভুলে গেলে চলবে না ◻ পূর্ণিমা কোঠারী ◻ ২৮

দেবতা হয়ে ওঠাই হিন্দুধর্মের সাধনা ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

আমাদের দেশের নামকরণ ও মহিমা ◻ ডাঃ দিলীপ কুমার সরকার ◻ ৩৪

রাজনীতিতে রং হারাচ্ছে ঘাসফুল ◻ ভবানী শঙ্কর বাগচী ◻ ৩৫

মমতাকে টলিয়ে দিয়েছে সাগরদিঘির ঢেউ ◻ সুকল্প চৌধুরী ◻ ৩৮

মোদী ম্যাজিকে বিরোধীরা কুপোকাত ◻ রামানুজ গোস্বামী ◻ ৪৩

শীর্ষ আদালতের দ্বিচারিতা ◻ তারক সাহা ◻ ৪৪

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ খেলা : ৪৫-৪৬ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
২৭ মার্চ
২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৭ মার্চ
২০২৩

ভারতবর্ষের ধারণা ও শ্রীরামচন্দ্র

ক্যালেন্ডারে চৈত্র মাসের দেখা মিললেই বোঝা যায় রামনবমী আসতে আর বেশি দেরি নেই। সকলেই জানেন রামনবমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষে আবিভূত হয়েছিলেন। যদিও তখন ভারতবর্ষ নানা ছোটবড়ো রাজ্যে বিভক্ত। তাদের মধ্যে নিত্য ঝগড়াঝাটি, যুদ্ধবিগ্রহ। শ্রীরামচন্দ্রই প্রথম সমগ্র ভারতকে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ করেন। রামনবমী উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় : ভারতবর্ষের ধারণা ও শ্রীরামচন্দ্র।

লিখবেন— ড. জিষ্ণু বসু, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, ড. রাজলক্ষ্মী বসু প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বহু বলিদানের পরিণাম রামমন্দির

এক সময় বৈদেশিক আক্রমণকারীরা বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে। ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিকে পদদলিত করিয়াছে। শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু মঠ-মন্দির-বিগ্রহ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছে। নারীজাতির সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও প্রায় হাজার বৎসরের আক্রমণ ও পরাধীনতায় ভারতবাসীর স্বাভিমান তাহারা ধ্বংস করিতে পারে নাই। প্রতিবার প্রচণ্ড লড়াই করিয়া হিন্দুরা সেই আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। তাই বলা হইয়া তাকে, ভারতবর্ষের ইতিহাস সতত সংগ্রামের ইতিহাস। কোনো সময়েই হিন্দুরা আক্রমণকারীদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নাই। হানাদাররা ধ্বংস করিয়াছে, হিন্দুরা পুনরায় নির্মাণ করিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতীক যে শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহার জন্মভূমিতে অবস্থিত মন্দির তাহারা ধ্বংস করিয়া মসজিদে রূপান্তরিত করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া সেই কলঙ্কচিহ্ন হিন্দুর মর্মস্থলকে বেদনাবিদ্ধ করিয়াছে। প্রাণের ঠাকুরের অপমান হিন্দুরা সহ্য করিতে পারে নাই। রামজন্মভূমি উদ্ধারের জন্য তাহারা ছিয়াত্তরবার লড়াই করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ রামভক্তের বলিদান হইয়াছে। ১৫৩০ হইতে ১৫৬৫ পর্যন্ত হুমায়ুন ও শেরশাহের শাসনকালে দশবার লড়াই হইয়াছে। ১৫৫৬ হইতে ১৬০৫ পর্যন্ত আকবরের শাসনকালে কুড়িবার লড়াই হইয়াছে। ১৬৫৮ হইতে ১৭০৭ পর্যন্ত অওরঙ্গজেবের শাসনকালে ত্রিশবার লড়াই হইয়াছে। বিক্ষিপ্তভাবে আরও ষোলোবার লড়াই হইয়াছে। এই সব যুদ্ধে স্থানীয় রাজা-মহারাজা ও সাধুসন্তরা নেতৃত্ব দিয়াছেন। গুরু গোবিন্দ সিংহও রামমন্দির পুনরুদ্ধারকল্পে যুদ্ধ করিয়াছেন। ইসলামি শাসনকালে যেমন লড়াই চলিয়াছে, তেমনই ব্রিটিশ শাসনকালেও লড়াই চলিয়াছে। ইংরাজ শাসনকালে কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো আইনি লড়াই করিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে গুজরাটে সোমনাথ মন্দির পুনরুদ্ধারের পর হিন্দুদিগের আশা বলবতী হইয়াছিল যে এইবার অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির, মথুরায় শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি মন্দির পুরুদ্ধার হইবে। ইতিহাস সাক্ষী, সোমনাথ মন্দির পুরুদ্ধার হইলেও প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বিরোধিতায় শ্রীরামজন্মভূমি ও শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি মন্দির পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় নাই। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা বরাবরই ইসলামি আক্রমণ ও শাসনকালের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসকে 'হোয়াইট ওয়াশ' করিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্বভাবতই স্বাধীন ভারতে শ্রীরামজন্মভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য দীর্ঘ আইনি লড়াই করিতে হইয়াছে। মন্থর আইনি প্রক্রিয়ায় একসময় ধৈর্য হারাইয়া শত শত রামভক্ত বিতর্কিত সৌধের গম্বুজশীর্ষে গৈরিক পতাকা উত্তোলন করিয়াছে। তাহাতেই ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হইয়া ভোটভিখারি মুলায়ম সিং সরকারের পুলিশ বহু করসেবককে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। কলকাতার দুই তরুণ করসেবক রামকুমার কোঠারী ও শরদকুমার কোঠারীও তাহাতে বীরগতি লাভ করিয়াছে। এই ঘটনার মাত্র দুই বৎসর পর সমগ্র দেশ হইতে আগত কয়েক লক্ষ করসেবকের পুঞ্জীভূত ক্ষোভে সেই বিতর্কিত সৌধ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। এবং ইহার সঙ্গেই হিন্দুর ললাটের একটি কলঙ্কচিহ্ন অপসারিত হয়। ইহারও উনত্রিশ বৎসর পর ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর চল্লিশ দিন ধরিয়া সওয়াল জবাবের পর ভারতের সর্বোচ্চ আদালত শ্রীরামমন্দিরের অধিকার হিন্দুদের হস্তে অর্পণ করেন। ইহার সঙ্গেই প্রায় পাঁচশত বৎসরের সংঘর্ষের বিরাম ঘটে এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জয় হয়। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশেই ২০২০ সালের ৫ আগস্ট ভিত্তিপূজা সম্পন্ন হইয়া মন্দির নির্মাণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়।

এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, রামজন্মভূমি মন্দির আন্দোলন স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আন্দোলন। কিন্তু লজ্জার বিষয় হইল, ইসলামি শাসনকালের ন্যায় স্বাধীন ভারতেও রামবিরোধী রাজ্য সরকারের পুলিশের গুলিতে রামভক্তদের প্রাণ দিতে হইয়াছে। এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, রামভক্তদের ত্যাগ, তপস্যা, সংঘর্ষ ও বলিদানের পরিণাম হইল রামমন্দির। দেশ-জাতি এবং ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষায় প্রাণ বলিদান বড়োই গৌরবের বিষয়। আর এই গৌরবের অংশীদার কলকাতার কোঠারী পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাজ্যের মানুষও।

সুভাষিতম্

সর্বতীর্থময়ী মাতা সর্বদেবময়ঃ পিতা।

মাতরং পিতরং তস্মাৎ সর্বযত্নেন পূজয়েৎ।।

মাতা সমস্ত তীর্থস্বরূপা আর পিতা সমস্ত দেবতাস্বরূপ। সেজন্য মাতা-পিতাকে সর্বপ্রকারে যত্নের সঙ্গে সেবা করা উচিত।

মমতা কি গবেট ?

লোভী বুদ্ধিরা মরীচিকাকে জলই ভাবেন

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

রাজ্য আইনসভায় নিজেকে 'গবেট পলিটিশিয়ান' বা 'বোকা রাজনীতিক' বলে ঘুরিয়ে নাক দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়। নিজেকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা মমতার চিরদিনের। সব রাজনীতিকের মতো তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে থেকে সেই আয়নায় নিজেকে দেখতে চান না। মমতার দাবি, তাঁর বুদ্ধিতেই কৃষিবিজ্ঞানীরা 'নোনা স্বর্ণ ধানের' ধারণা পেয়েছেন। দাবিটা সত্য। কারণ অসত্য হলেও কোনো কৃষিবিজ্ঞানী তার বিরোধিতা করবেন না। কারণটা ভয়। তাই বাধ্য হয়েই রাজ্যের মানুষ তা মেনে নেবেন।

মমতা বলতে চান এরপরেও অনেকে তাঁকে গবেট ভাবেন। কারণ তিনি সবার লকেট নন। হতেও চান না। তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা আড়ালে ব্যঙ্গ করে বলছেন, সাগরদিঘি নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর এটা মমতার নতুন উপলব্ধি। আমার কাছে এটা সর্বনাশের নতুন ধাপ। ভুল না স্বীকার করার ব্যাধি।

রাজ্যজুড়ে যে নৈরাজ্য চলছে তার ব্যাখ্যা কেবল আচার্য চাণক্যই দিতে পারেন। তাঁর কথায় লোভী বুদ্ধির মানুষরা মরুভূমির মরীচিকাকে কেবল জল ভাবেন। একসঙ্গে এতগুলি রাজনৈতিক দুষ্কৃতীর সমাহার স্বাধীনোত্তর ভারতে আর কোনো রাজ্যে ঘটেছে বলে আমার মনে পড়ছে না। শুনেছি, পাশের রাজ্য উত্তর প্রদেশে আনুমানিক দু'হাজার সমাজবিরোধীকে চিরতরে নিকেশ করেছেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাদের ভেতরে অনেকে নাকি তাঁর দলেরও তল্পিবাহক ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে এসবের কোনো বালাই নেই। এখানে অভিযুক্ত নেতারা মমতা প্রশাসন আর দলের সম্পদ।

এক সময় সিপিএম এভাবেই সমাজবিরোধীদের দলের সম্পদ বানাতো। অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল করে বলত 'সূর্যোদয়' হয়েছে। মমতার দলে দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের লোক দেখানো শাস্তি হয়। বাতিল করা হয় না। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। সাসপেন্ড হয়েছেন। বহিষ্কৃত হননি। অভিযোগ এখনো প্রমাণিত হয়নি তাই। অদ্ভুত যুক্তি! অদ্ভুত দল তৃণমূল। আর অদ্ভুত মমতার প্রশাসন।

আবার অনুব্রত মণ্ডলের ক্ষেত্রে দল কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। মমতা তাঁর প্রিয় 'কেষ্ট'কে পক্ষীমাতার মতো আগলে রেখেছেন। নিজের দোষ বা ভুলের মতো অনুব্রতর কোনো দোষ বা ভুল মমতার চোখে পড়ে না। তাই কেষ্টকে নিয়ে মমতা নীরব।

অনেকে দাবি করেন, বহু নেতার মতো মমতাও নাকি 'মেগ্যালোম্যানিয়া' মনোরোগে আক্রান্ত। এবিষয়ে আমি অজ্ঞান। তাই শুধু শোনা কথা বললাম। গোরুপাচারের সঙ্গে যুক্ত নিকৃষ্ট সমাজবিরোধীদের রাজনৈতিক মদত আর ভয় দেখিয়ে বিপুল পরিমাণে বেআইনি অর্থ আর সম্পত্তি আত্মসাতে অভিযুক্ত অনুব্রত। নজিরবিহীনভাবে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় তিনি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। ১৯৯৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে দল করার সময় থেকেই মমতার পাশে রয়েছেন অনুব্রত। সেসময় এক-একজন স্থানীয় নেতার হাতে সেই জেলার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন মমতা। সিপিএম জমানায় ২০০০-০১ সালে বীরভূমের নানুর আর ছোটো আঙারিয়ায় নারকীয় হত্যাকাণ্ড হয়। কিছুদিন আগে মমতা জমানায় বগটুইতে তার পুনরাবৃত্তি হয়। এবারে অভিযুক্ত হন অনুব্রত। আমার ধারণা, অনুব্রতর সেই পুরোনো ঋণ মমতাকে এখন নির্মমভাবে পরিশোধ করতে হচ্ছে।

দুর্নীতিবাজদের চক্রব্যূহে স্বেচ্ছায় আটকে রয়েছেন মমতা। তাই এটা ভাবা স্বাভাবিক যে মমতা হয়তো তাদের একজন হয়ে গিয়েছেন।

পার্থ আর অনুব্রতর পর মমতা-ঘনিষ্ঠ অনেক নেতাই শীঘ্র নরকের দরজা দেখবেন। এই রাজ্যের নরকের তিন দ্বার— সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, নারদ ঘুষকাণ্ড আর গোরুপাচার ও চুরি। একটি খুললে বাকিগুলো খুলে যাবে। দুর্নীতিবাজদের চক্রব্যূহে স্বেচ্ছায় আটকে রয়েছেন মমতা। তাই এটা ভাবা স্বাভাবিক যে মমতা হয়তো তাদের একজন হয়ে গিয়েছেন। মমতা নিজেকে ঠাট্টা করে 'গবেট' বা 'বোকা' রাজনীতিক বললেও আমি বিষয়টি হালকা করে নিচ্ছি না। বিশ্ববিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড বলতেন, 'ঠাট্টা আর আবোল তাবোল ভাষণের মধ্যে লুকিয়ে থাকে মনোবিকার বা নিজের সম্পর্কে সত্য ধারণা।' পার্থ আর অনুব্রতরা শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের মনের ম্যাপ থেকে মুছে যাবেন। আর মমতা— ?

তাঁর কী হবে সেটাই দেখার। □

দুধেল গাইয়ের লাথি, বড্ড ব্যথা

মুসলমানদরদিষু দিদি,

সাগরদিঘির ফলাফলের পর সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে কী আপনি উদ্বিগ্ন? স্বীকার না করলে হবে না দিদি। আপনার মুখেই উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। সাগরদিঘির পড়া ঢিল আলোড়ন ফেলে দিয়েছে শাসক শিবিরে। ফল প্রকাশের দিন আপনি বলেছিলেন বটে যে, 'সাগরদিঘির উপনির্বাচনে আমরা হেরেছি। কাউকে দোষ দেব না। গণতন্ত্রে হার-জিত লেগেই থাকে।' কিন্তু তারপরেই মন্ত্রীসভার বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শুনছি, ভয় আর চিন্তা মিলিয়ে আপনার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন এমন এক মন্ত্রীদাদার থেকে কথাটা শোনার পরে না দিদি, ওই রাতটায় আমি ঘুমোতে পারিনি। বিশ্বাস করুন, দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

সেদিনই তো আপনি আপনার সংখ্যালঘু মন্ত্রী-নেতাদের ডেকে ঘরোয়া বৈঠক করেছিলেন। সংখ্যালঘুরা সরে যাচ্ছেন কিনা, এই মর্মে খোঁজ নিয়ে দ্রুত রিপোর্ট দিতেও বলেছেন। আপনার চিন্তা এবং চোখে জল আসার কারণ রয়েছে। জনজাতির মানুষদের আপনি ঘৃণা করেন বলে কেউ ভোট দেয় না। চাকরি বিক্রি করে শিক্ষিত সমাজের ভোট গিয়েছে। সবেধন নীলমণি পড়ে রয়েছে মুসলমান ভোট। যাদের আপনি অবশ্য দুধ দেওয়া গোরু বলে মনে করেন।

সাগরদিঘিতে ৬৪ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটারের মধ্যে কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছে ৪৭.৩৫ শতাংশ ভোট। তবে একইসঙ্গে এ কথাও ঠিক যে, রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে একটি আসন কোনও 'নমুনা'ই নয়। কিন্তু বিরোধী শিবির উৎসাহ পেয়েছে সাগরদিঘির ফলাফলে। এখানে হিন্দু ভোটার কম তাই কংগ্রেস জিতে গিয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ আসন তো তা নয়। সেখানে মুসলমান ভোট সরে গেলে আপনার হাতে পেনসিল থাকবে। আর বাম-কংগ্রেস জোট ভোটা কাটাকাটির কারিগর হয়ে উঠবে। ফায়দা প্রধান বিরোধী দল বিজেপির। সঙ্গে দিদি একটা কথা বলে রাখি, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট তো বটেই সদ্য শেষ হওয়া নাগাল্যান্ডেও কিন্তু সংখ্যালঘু ভোট বিজেপির বাক্সে গিয়েছে। তাই চিন্তা রয়েছে।

সাগরদিঘিতে তৃণমূলের ভোটপ্রাপ্তির হার ৫০.৯৫ থেকে ৩৪.৯৩ শতাংশে নেমে আসাকে যে আপনি সহজ চোখে দেখছেন না, সেটা বুঝিয়েই বাংলার সংখ্যালঘুর মনের খোঁজে সংখ্যালঘু নেতা-মন্ত্রীদের নিয়ে কমিটি তৈরি করেছেন। অনেকে বলছেন, ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে টানা জেলবন্দি করে রাখার 'প্রভাব' পড়েছে সাগরদিঘির ভোটে। প্রসঙ্গত, নওশাদ ভাঙড়ের বিধায়ক হলেও ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা পরিবারের সদস্য। নওশাদকে জেলে রাখার বিষয়টিকে যে তৃণমূল সংখ্যালঘু ভোট হারানোর কারণ হিসেবে একেবারে ফেলে দিচ্ছে না, তা স্পষ্ট হয়েছে ফুরফুরা শরিফ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে সরিয়ে সেই পদে হুগলি জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি তথা বিধায়ক তপনকে বসানোয়। কিন্তু দিদি, তাতে কি কাজের কাজ হবে? শিক্ষক নিয়োগ থেকে আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন দুর্নীতির যে বিষয়গুলি প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে মুসলমান সমাজেও শাসকের প্রতি 'অসন্তোষ' তৈরি হয়ে থাকতে পারে।

পরিসংখ্যান বলছে, সংখ্যালঘু ভোট সরে গেলে তৃণমূলকে চিন্তায় পড়তে হবে রাজ্যের বহু বিধানসভা আসনে। ৫০ শতাংশের বেশি মুসলমান ভোটার রয়েছেন, রাজ্যে এমন আসনের সংখ্যা ৪৯। ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ মুসলমান ভোটার রয়েছে, এমন আসন ৭৭টি। ১১৫টি আসনে মুসলমান ভোটার ১০ থেকে ২৫ শতাংশ। পাশাপাশি, গত বিধানসভা নির্বাচনের ফল বলছে, রাজ্যে ৩৬টি আসনে পাঁচ হাজারের কম ভোটে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছিল। এমন ২২টি আসনে বিজেপি, ১৩টিতে তৃণমূল এবং একটিতে বিনয় তামাংয়ের জিজেএম জয়ী হয়। কম ব্যবধানের ৩৬টির মধ্যে আবার ৭টি আসনে জয়ীরা ১ হাজারেরও কম ভোটে এগিয়েছিলেন। পৌনে দু'বছর আগে ৫০,২০৬ ভোটে তৃণমূল জিতেছিল সাগরদিঘিতে। সেখানে তারা এবার হেরেছে ২২ হাজারের বেশি ভোটে। এই ধারা শুরু হলে কম ব্যবধানের আসনগুলি আরও 'দুর্বল' হয়ে পড়তে পারে। মনে করা হচ্ছে সংখ্যালঘু ভোট একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে রাজ্যে শতাধিক আসন তৃণমূলের পক্ষে 'চিন্তার' হয়ে উঠবে। দিদি, আপনার চোখের কোণ চিক চিক করার কারণ যথেষ্ট। সমবেদনা রইল।

আজ সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে দিদি। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১৮ আসনে জয় পেয়ে রাজ্যে বড়ো উত্থান হয়েছিল বিজেপির। তৃণমূল ৩৪ থেকে ২২ আসনে নেমে যায়। ফলপ্রকাশের পরে হ্যাঁ দিদি, আপনি, আপনিই বলেছিলেন, 'আমি তোষণ করি। হাজার বার করব! যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথিও ভালো।'

লাথি মারা কি শুরু হয়ে গেল? প্রথমটাতেই বড্ড ব্যথা লেগেছে দিদি। ▯

অতিথি কলম

সন্দীপ শাস্ত্রী

কর্ণাটকের রাজা ও রাজা তৈরির কারিগররা

নির্বাচন সর্বদাই একটি পরিকল্পিত ধারনার লড়াই— কে জনতার হয়ে কেমন কাজ করেছে, বর্তমান নেতাদের কর্মদক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে জনমনে প্রভাব ও রাজ্যের মাটিতে কাজ করার ক্ষেত্রে কোন দল বা নেতার কেমন দক্ষতা ইত্যাদি।

সিধে নজর ফেললে মোদী ও ইয়েদুরাপ্পার সঙ্গে কংগ্রেসের সিদ্ধিরামাইয়া আর ডি কে শিবকুমারের সম্মুখ সমরই চোখে পড়বে। কিন্তু বরাবরের মতোই এই নির্বাচনী যুদ্ধেও গৌড়াদের হাতেই হয়তো সিন্দুকের চাবিকাঠিটি রয়েছে।

হ্যাঁ, বিধানসভা নির্বাচন সমাগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই দক্ষিণের রাজ্যটির রাজনৈতিক তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। প্রতি দিনই তৈরি হওয়া উষ্ণ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নতুন মোড় ঘোরানো চমক নিয়ে আসছে। আগামী দু-মাসের বেশি কিছু সময়ের মধ্যেই সেখানের রাজনীতির নব কলেবর উন্মোচিত হবে। এই পটভূমিকায় চারটি সূত্র আমার কাছে ভালোভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

প্রথমত, কর্ণাটক কি তার প্রতি পাঁচ বছরে নতুন কারোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ধারাটি এবারেও বজায় রাখবে? এই চেয়ার পাল্টাপাল্টি করার রাজনৈতিক ধারা সেই ১৯৮৯ সাল থেকে বহাল রয়েছে। বিজেপি কি ট্র্যাডিসন ভেঙ্গে নবোত্থান ঘটাবে, নাকি কংগ্রেস ভোটারদের মধ্যে গ্রোথিত হয়ে যাওয়া এই ধারার প্রভাবে ক্ষমতা দখল করবে? উভয় দলের পক্ষ থেকেই তীব্র প্রতিযোগিতা দৃশ্যমান। দু'দলের রাজনৈতিক কলাকৌশলেই এই ট্রেন্ডকে ভেঙে ফেলা কিংবা বজায় রাখার সংগ্রাম জারি রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, চতুর্থবারের জন্য রাজ্যটি কি ফলাফলে ত্রিশঙ্কু বিধানসভার চেহারা নেবে? এই অবস্থা পুনঃপ্রদর্শিত হলে বিজেপি ও কংগ্রেস উভয়েই বেশি সংখ্যায় আসন জিতবে আর যথারীতি জনতা (এস) তৃতীয় স্থানে থাকবে। স্মরণে আসে ১৯৮৩ সালে রাজ্যটির প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট দল সরকারগঠনকারী সংখ্যায় জয়ী হয়নি তখনই একদলীয় আধিপত্যের রাজনীতি ভেঙে বহুদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের প্রাধান্য শুরু হলো। আবার ২০০৪ সালে যখন কোনো একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ক্ষমতায় আসতে ব্যর্থ হলো তখনই কংগ্রেস বনাম জনতা পার্টির দ্বিদলীয় লড়াইয়ের জায়গা নিল কংগ্রেস বনাম বিজেপির নির্বাচনী সমর। ২০১৮ সালে এই দ্বিদলীয় লড়াই আবার নতুন চেহারায় তিন দলীয় নির্বাচনী প্রতিযোগিতার রূপ নিল। কেননা, উত্থান হয়েছে জনতা দল (সেকুলার)-এর। একলাইনে ডবল ইঞ্জিন— ২০১৮ সালের পরের রাজনীতির চেহারা ক্রমশ আবার দ্বিদলীয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথই নিল, যেখানে তৃতীয় শক্তিটি প্রায় প্রান্তিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রইল। ধারাবাহিকতা ধরা পড়ল নির্বাচনের পর, কংগ্রেস জনতা সব নিয়ম ভেঙে সরকার গঠন করার পর যখন উভয় দল থেকেই যথেষ্ট সংখ্যক বিধায়ক দল ছেড়ে সরকার ভাঙল। তারা বিজেপিতে যোগ দিল। কিন্তু মানুষ যে এই কংগ্রেস-বিজেপির মধ্যেই তাদের পছন্দ ধরে রাখতে চাইছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই দলছুটরা উপনির্বাচনে গরিষ্ঠাংশই বিজেপির হয়ে জিতে ফিরে আসায়। নির্বাচকমণ্ডলী প্রমাণ করল তারা যে কোনো একটি দলের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, মজবুত সরকারের পক্ষেই।

তৃতীয়ত, নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী তাদের নিজস্ব বিশেষ কৌশল নির্ধারণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শাসক বিজেপি সর্বদা ডবল ইঞ্জিনের কথা বললেও নজরে পড়ছে তাদের কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনটির ওপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার। অবশ্য স্থানীয় ইঞ্জিনটির যোগদানকেও অস্বীকার করা হচ্ছে না, বরং অপরিহার্য বলেই গণ্য করা হচ্ছে। দলের ভোট প্রচার চলছে দ্বিমুখী। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকার সামগ্রিকভাবে কী কাজ করেছে এবং কর্ণাটকের জন্য বিশেষ কী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে এবারে দল বিজয়ী হলে রাজ্যের জন্য কী কী চমকপ্রদ পরিকল্পনা রয়েছে।

বিজেপি অবশ্যই বিপুল জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চুম্বক ব্যক্তিত্বের ওপর সবিশেষ নির্ভর করছে। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে দলীয় সভাপতি ও গৃহমন্ত্রী ঘন ঘন প্রকাশ্য সমাবেশ করছেন। নতুন পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করা হচ্ছে। এই নজরে পড়ার মতো কাজগুলি ভোট নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বাড়বে।

নতুন রেলওয়ে জংশন ও মালগাড়ি— বিজেপি তাদের দীর্ঘদিনের কর্ণাটকের সর্বোচ্চ নেতা ইয়েদুরাপ্পাকে পুনরায় ভোটমঞ্চে পূর্ণদ্যোমে উত্তরণের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যায় পড়েছে। ইতিপূর্বেই ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী রাজনীতিতে যে আর যোগ দেবেন না তা

ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য তিনি ভোট প্রচারে যথেষ্ট সক্রিয় থাকবে, যাতে দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বরাবরই দলের অধরা থেকেছে কর্ণাটকে। ইয়েদুরাপ্পার ব্যক্তিগত প্রত্যাশা সময়ে সময়ে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বরাবরই তাঁর অনুগামীরা যাতে উপযুক্ত গুরুত্ব পায় এবং তাঁর ছোট ছেলে যেন সঠিক মর্যাদা পায় তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর দীর্ঘদিনের বিধানসভা আসনটিতে তাঁর পুত্রের মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে দাবি রেখেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দল কি এটা অনুমোদন করবে? এরই সদর্থক বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে তিনি নির্বাচনে কতটা শক্তি ও আগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হবেন। অন্যদিকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রচারে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নাম উল্লেখ খুব কমই হচ্ছে। কিছুদিন ধরে তিনি কিছুটা ব্যাকফুটে চলে গেছেন। বিশেষ করে সম্প্রতি দলের এক বিধায়ক একটি দুর্নীতির মামলায় জড়িয়ে পড়ার পর। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সাম্প্রতিকতম একটি ট্যুইটে লিখেছিলেন, একটি বড়ো তাইওয়ানি কোম্পানি কর্ণাটকে একটি বড়ো ধরনের উৎপাদনী বিনিয়োগ করতে চায়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উল্লেখিত কোম্পানিটি এমন কোনো প্রস্তাবিত বিনিয়োগের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। এইসব কারণে বিজেপি এবারের কর্ণাটকের নির্বাচনী প্রচারটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতেই রাখতে চায়। বিগত চার বছরে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কিছুটা গৌণই থেকে যাচ্ছে, অর্থাৎ প্রায় সিঙ্গল ইঞ্জিন।

অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রচার সর্বাংশেই রাজ্য নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত। এক্ষেত্রে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি ডি শিবকুমার ও বিরোধী দলনেতা সিদ্দিরামাইয়াই ক্ষমতায় ফেরার লড়াইয়ের মুখ্য কারিগর। তাঁরা দুজনেই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দাবি পরিষ্কার করে দিলেও নির্বাচনী প্রচারকে তাঁরা কোনোমতেই দ্বিধাবিভক্ত বা দুর্বল হতে দিচ্ছেন না। এক্ষেত্রে মূল খেলাটা কংগ্রেসের ক্ষেত্রে কিন্তু টিকিট বিতরণ। এর ওপরই এই আপাতত শান্তির পরিবেশের ভারসাম্য অনেকটাই নির্ভর করবে। বর্ণিত দু'জন তো বটেই, এছাড়াও কংগ্রেস সভাপতি কর্ণাটকেরই মল্লিকার্জুন খাড়গে তাঁর নিজের সমর্থক ও নির্ভরযোগ্যদের জন্য একটা বড়ো সংখ্যা দাবি করবেন। এর প্রতিক্রিয়ায় বর্তমানের একতা কতটা অটুট থাকে সেটা লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

অন্যদিকে জনতা দল (এস) তাদের একমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীকে ঘিরেই আবর্তিত। দল তাদের প্রভাবিত ছোটো ছোটো অঞ্চলগুলিতে জয় পেতে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে এবং সর্বান্তঃকরণে চাইছে যাতে কোনো দলই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারে। পেলে তাদের সর্বনাশ। কোনো গুরুত্বই থাকবে না তাদের। কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে তারা রাজা তৈরির কারিগর হয়ে যাবে রাতারাতি। এর থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, কর্ণাটকের নির্বাচনী লড়াই বরাবরের মতোই কয়েকটি অঞ্চলভিত্তিক। এই সূত্রে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মহীশূর ও মুম্বাই ঘেঁষা কর্ণাটককে ঘিরে নিবিড় প্রচার লক্ষণীয়। এটি কৌশলগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দল বরাবরই এই পুরাতন মহীশূর অঞ্চলে অত্যন্ত কম আসন পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পথে এখানকার ন্যূনতম আসন জয় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অঞ্চলটিতে ভোদালিঙ্গা ভোট অত্যন্ত নির্ণায়ক শক্তি। মোট আসনের অর্ধেক পার করার ক্ষেত্রে এখানে ভালো ফল করা অত্যন্ত আবশ্যক।

এছাড়া দলকে উত্তর কর্ণাটক, হায়দরাবাদ-কর্ণাটক, মুম্বাই-কর্ণাটক অঞ্চলগুলিতে তাদের চিরাচরিত প্রাধান্য ধরে রাখতে হবেই। কংগ্রেসও উত্তর কর্ণাটকে তাদের ফল ভালো করতে চাইছে, যা বিধানসভা দখলে সহায়ক হবে। এখানেই লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের ওপর বিজেপির গভীর নিয়ন্ত্রণ। কংগ্রেস তাতে চিড় ধরাতে পারে কিনা সেটাই দেখার।

পরিশেষে বলতে হয়, নির্বাচন সর্বদাই একটি পরিকল্পিত ধারণার লড়াই— কে জনতার হয়ে কেমন কাজ করেছে, বর্তমান নেতাদের কর্মদক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে জনমনে প্রভাব এবং রাজ্যের মাটিতে কাজ করার ক্ষেত্রে কোন দল বা নেতার কেমন দক্ষতা। দু'মাসের মধ্যেই বোঝা যাবে এই ধারণা পরিমাপক যন্ত্রে কে এগোলো।

(লেখক লোকনীতির সহ সংযোজক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোক সংবাদ

সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের কার্যকর্তা বিমল রঞ্জন সরকার গত ৩১ জানুয়ারি মঙ্গলবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তৃতীয় বর্ষ প্রশিক্ষিত বিমলদা নকশালি অত্যাচার ও কংগ্রেসের শাসনের কালো দিনগুলোতে দমদম অঞ্চলে সঙ্ঘের শাখা করেছেন। পরবর্তীকালে বারাসাত বনমালিপুরেও সঙ্ঘকাজে দৃষ্টান্ত রাখেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তাঁর এক পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা সহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

****

দমদম মাধব নগর কার্যবাহ তথা পূর্বভাগের সহ সেবাপ্রমুখ প্রসূন চৌধুরীর মাতৃদেবী পূর্ণিমা চৌধুরী গত ৬ মার্চ বাঙ্গুর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সঙ্ঘপ্রাণ পূর্ণিমাদেবীর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা-সহ পুত্রবধূ, জামাতা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

সর্বনাশের দিনেও ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত পাকিস্তান

বর্তমানে আর্থিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত গোটা পাকিস্তান। পাকসেনার বেতন বন্ধ, খাদ্য সংকট। কিন্তু তবুও কাশ্মীর পরিস্থিতিকে জটিলতর করে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে পারে তারা এবং এক্ষেত্রে চীনের সক্রিয় মদতও লাভ করবে পাকিস্তান— গোপন মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে তেমনটাই দাবি করা হয়েছে। বিগত অর্ধশতকের মধ্যে পাকিস্তানের মূল্যবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চে গিয়ে পৌঁছেছে। বর্তমানে এই হার প্রায় ২৮ শতাংশের মতো। গত আর্থিকবর্ষে এই সময় পাকিস্তানে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল সাড়ে ১২ শতাংশের মতো। অর্থাৎ গত এক বছরে পাকিস্তানের অর্থনীতি এতটাই বেহাল হয়েছে যে মূল্যবৃদ্ধির এই চড়া হারকে কোনোমতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে পাকিস্তানের সেন্ট্রাল ব্যাংক ক্রমাগত সুদের হার বাড়িয়ে এই আর্থিক বেহাল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতেও পাক অর্থনীতির চাকা ঘুরছে না, বরং পেট্রোল ডিজেলের মতো জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অন্যান্য দ্রব্যের দামও ক্রমবর্ধমান।

কিন্তু কোনো পরিস্থিতিতেই ইতিপূর্বে পাকিস্তান সেনার বাজেটের সঙ্গে আপোশ করেনি সেদেশের কোনো সরকার, সে আর্থিক বা অন্যান্য পরিস্থিতি যত বেহালই হোক না কেন। কারণ পাকসেনাই সেদেশের সরকারের প্রাণভ্রমরা। তাই সেনার বাজেট কাটছাঁট করার ক্ষমতা কোনো পাকসরকারেরই ছিল না। কিন্তু সেদেশের আর্থিক পরিস্থিতি এমনই বেকায়দায় যে সেনার ক্ষেত্রেও ব্যয়সংকোচনের নীতি নিতে বাধ্য হয়েছে শাহবাজ সরকার। অথচ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটেও সেদেশের প্রতিরক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছিল। এতে করে গত বছরের তুলনায় এবার বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি পায় তিন শতাংশের মতো। কিন্তু সম্প্রতি সেনার কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল দপ্তর জানিয়েছে, সেনার জন্য খাদ্য বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। অর্থাৎ আগে যে পরিমাণ খাবার দেওয়া হতো, তা কমানো হয়েছে। এমনকী অন্য কর্মীদের মতো সেনাকর্মীদের বেতন দেওয়া নিয়েও অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। একটি সূত্রের দাবি, আপাতত বন্ধ হয়েছে জওয়ানদের বেতন।

অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, পূর্বপরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু এই আর্থিক পরিস্থিতিতে নিতান্ত অপারগ হয়েই সেনার বাজেটেও কোপ বসাতে বাধ্য হলো সেদেশের সরকার। তবে আমজনতার ওপর চাপ বাড়িয়ে সেনাকে সুখে রাখার মরিয়া চেষ্টা এখনো অব্যাহত। সুদীর্ঘ আলোচনার শেষে কঠিন শর্তের বিনিময়ে আইএমএফের ঋণ নিতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছে পাকিস্তান। তারপরেই এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির শর্ত মেনে নতুন বিল পাশও হয়েছে পাক-সংসদে। এর ফলে কর ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছে সরকার। সেই কারণে আমজনতার উপর করের বোঝা বিপুলভাবে বৃদ্ধিও পেয়েছে।

ইসলামাবাদের এই 'খারাপ সময়ে' যথারীতি পাশে দাঁড়িয়েছে 'বন্ধু' চীন। চীনের পক্ষ থেকে সাতশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার আপাতত ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানকে।

এদিকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রের খবর অনুযায়ী, যে কোনও সময় পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা। এর মধ্যে অনিবার্যভাবে চীনের ঢুকে পড়ার সম্ভাবনাও প্রবল। যদিও প্রতিবেদনে এমন মন্তব্যও করা হয়েছে যে, পাকিস্তান যদি কোনোভাবে ভারতকে উত্যক্ত করে, তাহলে কোনও অপেক্ষা ছাড়াই শত্রুপক্ষকে কড়া জবাব দিতে তৈরি ভারতও। দরকার হলে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে পালটা জবাবও দেবে মোদী সরকার।

অতিমারি পরবর্তীতে সারা বিশ্ব যখন আর্থিক বিপন্নতা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে, তখন পাক-চীনের যৌথ ষড়যন্ত্র কেবল দক্ষিণ এশিয়ার জন্যই নয়, সমগ্র মানবতার জন্য বিপজ্জনক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা দপ্তর প্রতি বছরই বিশ্বের কোন প্রান্তে হিংসাত্মক কার্যকলাপ হতে পারে, সেই মোতাবেক একটি প্রতিবেদন পেশ করে। এবছর আমেরিকার পেশ করা সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে কাশ্মীরের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, সন্ত্রাসবাদী হামলার কারণে দুই দেশের স্পর্শকাতর সীমান্ত পরিস্থিতি— ২০২০ সালে গালওয়ান সীমান্ত সংঘর্ষের পর থেকে এই দুই দেশ বহুবার আলোচনায় বসলেও সীমান্ত সমস্যা মেটানো যায়নি।

আবার ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে চীন নিজেদের সক্রিয়তা বাড়িয়েছে সামরিক ও পরিকাঠামো উন্নয়ন ক্ষেত্রেও। যেমন চীন দ্রুত রাস্তা তৈরি করেছে। পালটা ভারতও চীনকে জবাব দিতে তৈরি। ভারত এমন চওড়া ও দীর্ঘ রাস্তা তৈরি করেছে যে সেখান দিয়ে যুদ্ধের ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া সরঞ্জাম যাতায়াত করতে পারে। নয়াদিল্লি ইচ্ছা করলে চীন সীমান্ত পর্যন্ত আগের থেকে অনেক কম সময় পৌঁছে যাবে সেনারা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞদের ধারণা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এখন শাঁখের করাতের মতো অবস্থায় পড়েছে পাকিস্তান। তাঁদের অভিমত, নয়াদিল্লিও খুব ভালো ভাবেই জানে এর পরের সংঘর্ষ যেটাই হবে, সেখানে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে একসঙ্গে সামরিকভাবে লড়াই করতে হবে তাদের। তাই বিগত দেড় বছর ধরেই ভারত নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। মেক ইন ইন্ডিয়ার অধীনে বিভিন্ন অস্ত্র বানানো হয়েছে দেশে। নতুন করে ২৬টি যুদ্ধবিমানের চুক্তিও চূড়ান্ত করা হচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যেই। হাতে আছে রাশিয়ার তৈরি অত্যাধুনিক এস ৪০০ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম। যাইহোক, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অতিমারির পরবর্তী পর্যায়ে সারা বিশ্বের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়াও যখন আর্থিক দিক থেকে বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে, তখন পাক-চীনের যৌথ ষড়যন্ত্র কেবল দক্ষিণ এশিয়ার জন্যই নয়, সমগ্র মানবতার জন্য বিপজ্জনক। □

পশ্চিমবঙ্গের হাল দেখে শিক্ষা নিয়েছে ত্রিপুরা

চন্দ্রভানু ঘোষাল

কর্ণাটকে বিজেপি বিধায়কের পুত্র ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। ঘটনাটি যে সব দিক থেকে নিন্দনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় এই ঘটনা নিয়ে বাংলা মিডিয়ার লাফালাফি দেখলে। বাংলা মিডিয়া ইতিমধ্যেই এই ঘটনার জন্য পরোক্ষে নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে নিশানা করতে শুরু করেছে। অথচ কোনও সংবাদ মাধ্যম এটা লেখেনি যে বিধায়কের পুত্রের বিরুদ্ধে তদন্তে কর্ণাটকের বিজেপি সরকার বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করেনি। তদন্তকারী অফিসারেরা নির্বিঘ্নে 'ফাঁদ' পেতেছেন এবং অভিযুক্তকে বমাল ধরেছেন। শুধু তাই নয়, অভিযুক্ত প্রশান্ত মাদালের বিধায়ক পিতা মাদাল বিরূপাক্ষাপ্পা ইস্তফাও দিয়েছেন। বিজেপি যে দুর্নীতির সঙ্গে আপোশ করে না তার প্রমাণ কর্ণাটকের বিধায়কের ইস্তফা। পরবর্তীতে যদি বিধ্যায়কের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে তাহলে তিনি সম্ভবত দলের প্রাথমিক সদস্যপদও হারাবেন। বিজেপি দলের এটাই ট্র্যাজিশন। দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণও এই ট্র্যাডিশনের হাত থেকে রেহাই পাননি। সুতরাং কর্ণাটকের বিধায়কের ক্ষেত্রে যে তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটবে না সে কথা বলাইবাহুল্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও বিধায়কের পুত্র যদি ৪০ লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়তেন তাহলে কি তার বিধায়ক পিতা পদত্যাগ করতেন? প্রশ্নের সোজাসাপটা উত্তর, না। নারদ স্টিং অপারেশনে যাদের নোটের বান্ডিল নিতে দেখা গেছে তারা কেউই পদত্যাগ করেননি। দলও তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নানা সময়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দুর্নীতিতে ইন্ধন জুগিয়েছেন। দল চালাবার জন্য যাদের ওপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্ভর করতে হয় তাদের হাজারো খারাপ কাজ তিনি দেখেও দেখেন না। অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তদন্তের প্রয়োজনে ইডি তাকে দিল্লিতে নিয়ে যেতে চায়। একথা শুনে মমতা প্রশ্ন করেন, 'ও কী করেছে যে ওকে দিল্লিতে নিয়ে যেতে হবে?' এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে তিনি একটি রাজনৈতিক সেন্টিমেন্ট ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন। বোঝাতে চেয়েছেন অনুব্রতর কোনও দোষই নেই। ইডিকে শিখণ্ডী খাড়া করে বিজেপি অন্যায়ভাবে অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে যেতে চাইছে। অর্থাৎ দুর্নীতিকে সমর্থনই করছেন মমতা। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন ক্ষমতায় থাকার জন্য তিনি ন্যায় নীতি সব একবাক্যে বিসর্জন দিতে পারেন। তার জন্য যদি পশ্চিমবঙ্গ শ্মশানেও পরিণত হয়, মমতার কিছু যায় আসে না।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার তীব্র মোহ, বেলাগাম দুর্নীতি ও দান-খয়রাতির রাজনীতির ফলে স্বাধীনতর-উত্তরকালের একটি অগ্রণী রাজ্য আজ দেশের অন্যতম একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্যে পরিণত। গত পঞ্চাশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের এই পরিণতির কথা অবশিষ্ট ভারতও জানে। ঠিক যে কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখনই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তৃমমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা গাড়তে গেছেন তখনই ব্যর্থ হয়েছেন। সম্প্রতি ত্রিপুরাও তাঁকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। অথচ ভোটের প্রচারে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই পারে ত্রিপুরা থেকে বিজেপিকে উৎখাত করতে। এবং সেটা তারা করে দেখাবে।' স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'তেইশের নির্বাচনের পর ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠন করবে।' অথচ নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হবার পর দেখা গেল নোটার থেকেও কম ভোট পেয়েছে তৃণমূল। প্রশ্ন উঠতে পারে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি জানতেন না যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি আর প্রবাসী বাঙ্গালির মানসিকতা সম্পূর্ণ আলাদা। বিশেষ করে ত্রিপুরায় যেসব বাঙ্গালি থাকেন তাদের বেশিরভাগই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শরণার্থী। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অনেক ত্যাগ স্বীকার করার পর পায়ের নীচে মাটি আর মাথার ওপর ছাদ

> **তারা নিশ্চয়ই টিভিতে দেখেছেন পশ্চিমবঙ্গে টেট-উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা রাস্তায় বসে ধরনা দেয়। সরকারি কর্মীরা বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার জন্য রাস্তায় নামেন। এমনকী অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণে অসংখ্য শিশুর মৃত্যুর পরেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে ভয়ের কিছুই নেই। ত্রিপুরার মানুষ এসব জানেন। তাই তারা ত্রিপুরাকে তৃণমূলের ভাঁওতায় ভুলে পশ্চিমবঙ্গের মতো নামসর্বস্ব তালপুকুরে পরিণত করতে চাননি।**

ফঃ ২

পেয়েছেন। আত্মসম্মান বন্ধক রেখে জীবনে কোনও কাজই করেননি। এরা কেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো ভিক্ষা প্রকল্পের প্রতি আকৃষ্ট হবেন? কেনই-বা রূপশ্রী-কন্যাশ্রীর মতো খয়রাতি নিয়ে মাথা ঘামাবেন? তারা রাজ্যে শিল্প চাইবেন, আরও কর্মসংস্থান চাইবেন, ব্যবসা করার উপযুক্ত পরিবেশ চাইবেন এবং অবশ্যই চাইবেন দুর্নীতিমুক্ত সরকার ও প্রশাসন।

বলাবাহুল্য, এর কোনওটাই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ত্রিপুরার বাঙ্গালিরা জানেন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প নেই, চাকরি নেই--- সেই কারণে এখানকার মানুষজনের একাংশ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রতি আকৃষ্ট হন। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার জনমানসের আরও একটি পার্থক্য লক্ষণীয়। বাম আমল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের এক শ্রেণীর মানুষের অপরাধমনস্কতা ক্রমবর্ধমান। এরা অম্লানবদনে ঘুষ খান, সিন্ডিকেট রাজের ছত্রছায়ায় কাটমানি পকেটস্থ করেন। সরকারি হাসপাতালে, অফিসে, আদালতে কর্মসংস্কৃতি ধ্বংস করতে এদের জুড়ি নেই। রাস্তাঘাটে এদের সীমাহীন ঔদ্ধত্য বলে দেয় এরা শাসকদলের সমর্থক। এদের ইউনিয়ন আছে, বিপুলসংখ্যক ভোট আছে। তাই সরকার এদের ঘাঁটায় না। এমতাবস্থায় কোনও অগণতান্ত্রিক দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার যদি এদের তুষ্ট রাখার জন্য বা মুখ বন্ধ রাখার জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্প চালু করে তাহলে তো এরা হাত পেতে সেই ভিক্ষা গ্রহণ করবেনই। বলাবাহুল্য, ত্রিপুরার ছবিটা এরকম নয়। সেখানে অভাব হয়তো আছে কিন্তু কাঙালপনা নেই। আত্মসম্মানবোধও যথেষ্ট প্রখর। কতকটা সেই কারণেও ত্রিপুরায় তৃণমূল নোটার থেকে কম ভোট পেয়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই ত্রিপুরার মানুষের মন বুঝতে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব হিমালয়ান্তিক ভুল করেছেন। কোনও জায়গায় বাঙ্গালি আছে দেখলেই সেখানকার নির্বাচনে অংশ নেওয়া এবং অন্য জায়গায় খেটে যাওয়া টোটকা ব্যবহার করে বাজিমাত করার চেষ্টা আর যাই হোক রাজনৈতিক বিচক্ষণতা নয়। কোনও রাজ্যের মানুষের চাহিদা কেমন হবে তা নির্ভর করে সেখানকার আর্থ-সামাজিক গঠনতন্ত্রের ওপর। উন্নত বা উন্নতি করতে চাওয়া যে-কোনও রাজ্য জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ওপর জোর দেবে। অন্যদিকে, যেসব রাজ্য পিছিয়ে পঙ্গু তারাই দানখয়রাতিনির্ভর রাজনীতিকে আশ্রয় করবে। সুতরাং রাবড়ির হাঁড়ি দেখিয়ে সব জায়গায় কল্কে পাওয়া কঠিন। এই সারসত্য আম আদমি পার্টি বুঝেছে এবারের গুজরাট নির্বাচনে। তৃণমূল বুঝল ত্রিপুরায় ও নাগাল্যান্ডে।

> **ত্রিপুরায় অভাব হয়তো আছে কিন্তু কাঙালপনা নেই। আত্মসম্মানবোধও যথেষ্ট প্রখর। কতকটা সেই কারণেও ত্রিপুরায় তৃণমূল নোটার থেকে কম ভোট পেয়েছে।**

ত্রিপুরায় তৃণমূলের ভুল এখানেই শেষ নয়। তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব সম্ভবত জানতেনই না যে ত্রিপুরার জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ জনজাতি সম্প্রদায়। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনও গোঁজামিলেই তাদের বাঙ্গালি বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব অতি উৎকৃষ্ট সংস্কৃতি আছে। কিন্তু মুশকিল হলো, ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে তৃণমূলের কোনও জনসংযোগই গড়ে ওঠেনি। বেশিরভাগ মানুষ জানতেনও না যে তৃণমূল বলে একটা দল আছে এবং তারা এবার নির্বাচনে লড়ছে। কোনও ছাত্র যদি পরীক্ষা দিতে গিয়ে একশোর মধ্যে একত্রিশ নম্বর ছেড়ে দেয় তাহলে তার যেমন পাশ করার সম্ভাবনা কমে যায়, তৃণমূলেরও তাই হয়েছে।

ভাবতে অবাক লাগে, এত সামান্য পুঁজি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন সাহসে ত্রিপুরা থেকে বিজেপিকে উৎখাত করার কথা ভাবলেন! অভিষেকবাবু কি জানতেন না ত্রিপুরার বাঙ্গালিরা বাঙ্গালি বলেই পশ্চিমবঙ্গের খবর বেশি করে রাখবেন। তারা জানবেন দু'দিন অন্তর পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল নেতাদের ফ্ল্যাট থেকে টাকার বান্ডিল বেরোয়। তারা নিশ্চয়ই টিভিতে দেখেছেন পশ্চিমবঙ্গে টেট-উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা রাস্তায় বসে ধরনা দেয়। সরকারি কর্মীরা বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার জন্য রাস্তায় নামেন। এমনকী অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণে অসংখ্য শিশুর মৃত্যুর পরেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে ভয়ের কিছুই নেই। ত্রিপুরার মানুষ এসব জানেন। তাই তারা ত্রিপুরাকে তৃণমূলের ভাঁওতায় ভুলে পশ্চিমবঙ্গের মতো নামসর্বস্ব তালপুকুরে পরিণত করতে চাননি--- যেখানে মাথা খুঁড়ে মরলেও আজকাল আর ঘটি ডোবে না। □

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

বিদ্যাসাগর, রামমোহনের স্বপ্নের শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে মাত্র অর্ধশতকেই শেষ হয়ে গেল?

সুদীপ্ত গুহ

দশ লক্ষ থেকে ছয় লক্ষ। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক বছরে ৪০ শতাংশ কমেছে। সারা বিশ্বের ইতিহাসে এরকম ঘটনা সম্ভবত কোনো বড়ো রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময়ে বা বড়ো যুদ্ধ ছাড়া দেখা যায় না। যেমন বিশ্বযুদ্ধ, মাও-সে-তুঙের সাংস্কৃতিক বিপ্লব বা তালিবানের আফগানিস্তান অধিগ্রহণ। কিন্তু এক্ষেত্রে বাহ্যিক কোনও কারণ নেই। একমাত্র কারণ শিক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ অনাস্থা। শিক্ষার্থীদের মনে হয়েছে, মাধ্যমিক বোর্ড থেকে পাওয়া সার্টিফিকেট পেতে যে সময় খরচ হবে, তার দাম ওই কাগজের টুকরোর থেকে বেশি নয়। কলকাতা উচ্চ আদালতের এক বিচারক বলেই দিয়েছেন যে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করে লাভ নেই। সংস্কার শুরু হোক আগে। কিন্তু কেন এই অনাস্থা? বিদ্যাসাগর, রামমোহন থেকে জাতীয় স্কুল আন্দোলনের মাধ্যমে উঠে আসা দেশের সেরা শিক্ষাব্যবস্থা যা সাতের দশক পর্যন্ত আইসিএসই, সিবিএসই-কে ধর্তব্যর মধ্যেই রাখতো না সেখানে এই দুরবস্থা কেন? এর জন্য শুধু কি বর্তমান সরকার দায়ী? নাকি আরও কিছু?

চার দশক আগে ফিরে যাই। ১৯৮২-তে ইংরেজি তুলে দেওয়া এবং সরকারি স্কুলে অনিলায়ন মধ্যবিত্তদের আইসিএসসি, সিবিএসই-র দিকে ঠেলে দেয়। নিন্দুকেরা বলেন, অনিলায়ন চারজন অনিলের সৃষ্টি। শুধু বিশ্বাস নন, অনিলা দেবী, অনিল ভাট্টাচার্য, অনিল বসাক ও অনিল বিশ্বাস। ১৯৮২-এর আগে সরকারি ক্লাস ওয়ান অফিসাররাও বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পাঠাতেন তাঁদের সন্তানদের। কিন্তু আশি ও নব্বইয়ের দশক থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দু, হেয়ার থেকে সাফল্যর সঙ্গে পাশ করা বাবা-মায়েরা তাঁদের সন্তানদের সরকারি বাংলা স্কুলে পাঠানো বন্ধ করেন। কারণ সরকারি স্কুলের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা এবং ১৯৯১-তে আর্থিক সংস্কার আসার ফলে ইংরেজির গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যাওয়া। কিন্তু সাউথ পয়েন্ট, সেন্ট লরেন্স বা পাঠ ভবনে তখনও পাঠানো বন্ধ করেনি। ২০০০ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের প্রতিও আস্থা কমতে থাকলো। কারণ, পুরোনো বস্তাপচা সিলেবাস এবং মধ্য শিক্ষা পর্ষদের দুর্নীতি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভোটের জন্য জেলার স্কুল থেকে কিংবা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে ভালো নম্বর পাইয়ে দেওয়া এবং রামকৃষ্ণ মিশন বা সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্রদের পিছিয়ে দেওয়া অন্যতম কারণ। ২০০৭-এ সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন থেকে যাতে বিরোধীরা রাজনৈতিক ডিভিডেন্ট না পায়, মাধ্যমিকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ছাত্রদের প্রথম দশে নিয়ে আসা হয়। এর আগেই সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতারা তাঁদের স্কুল বিক্রি করে নিজেরা আইসিএসই স্কুল খোলেন। কয়েক বছর পর সাউথ পয়েন্টও নিজেদের সিবিএসই করে নেয়। নতুন সাউথ পয়েন্ট ম্যাজেনমেন্ট পরে মাধ্যমিক থেকে নিজেদের সিবিএসই করে নেয়।

> সামাজিক সচেতনতা অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের অপ্রতুলতা আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যও আমাদের প্রয়োজন। মানুষকে বুঝতে হবে যে শিক্ষাই একমাত্র রাস্তা যা আমাদের দারিদ্র্যমুক্তি দিতে পারে।

কিন্তু এর মধ্যে রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের সংস্কৃতি দিল্লি, রাজস্থান কিংবা অন্ধ্র, তামিলনাড়ু থেকে অনেক পিছিয়ে যায়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পিছিয়ে যেতে থাকে কলকাতার তথাকথিত সেরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও। ২০০৪-০৫ সাল থেকেই কলকাতার ছাত্র-ছাত্রী কোটা, হায়দরাবাদ বা চেন্নাইতে ১১-১২ ক্লাসে পড়তে যেতে থাকে। যাদের সামর্থ্য নেই, তারা ড্যামি স্কুলে ভর্তি হয়ে এফআইআইটি,জেইই বা আকাশে কোচিং নেওয়া শুরু করে। এক্ষেত্রে দু' বছর স্কুলে না গিয়ে স্কুল মালিককে কিছু অতিরিক্ত টাকা দিলে তারা উপস্থিতি দেখিয়ে দেয়। অনেকেই বলবেন, কোচিঙে যদি সাফল্য পায়, তাতে পর্ষদ বা সংসদ কী করবে? কিন্তু একসময় তো রামকৃষ্ণ মিশনগুলি বা সাউথ পয়েন্ট স্কুলেই এই শিক্ষা দিত?

২০১১-র পর ঘটলো আরও বড়ো বিপত্তি। শিক্ষাদপ্তর যেহেতু পুরো বামেদের আখড়া, তৃণমূল সরকার এদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল। বামযুগেও পিছনের রাস্তা দিয়ে শিক্ষক নেওয়া হতো। কিন্তু উদ্দেশ্য ও পন্থা দুটোই ছিল আলাদা। বামেদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, নিজের ক্যাডারদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা যাতে তারা শিশুদের মাথা খেতে পারে। সঙ্গে স্কুল কমিটির টাকার প্রলোভন তো ছিলই। সেই সময় একসঙ্গে টাকা নেওয়া হতো না। স্কুল কমিটিগুলি দাদাগিরি করে প্রথমে দখল করতো লোকাল কমিটি, তারপর শিক্ষক নিয়োগ করতো তারাই। কিছু ক্ষেত্রে অগ্রিম এবং কিছু ক্ষেত্রে সারা জীবন পার্টির সদস্য হিসেবে 'লেভি'। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা স্থানীয়ভাবে চলত।

ক্রমাগত খারাপ অবস্থায় যাওয়ার পরেও বাম আমলে শিক্ষাব্যবস্থা একটা অন্য উচ্চাতায় ছিল এবং সেই শিক্ষকদের অনেকেই ২০০০ সাল পর্যন্ত চাকরি করেন। এই বাঙ্গালি একসময় দেশের সেরা অঙ্ক বই লিখেছে। যাদব চক্রবর্তী, দাস মুখার্জী, গাঙ্গুলী মুখার্জী, কেশব নাগ, কেপি বসু, সৌরেন দে, মৃদুল সেন থেকে আজকের এ দাশগুপ্ত। অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও বহু এমন উদাহরণ আছে। ফলে রাতারাতি এত বড়ো গাছ পড়বে না। কিন্তু যখন তারা রাজ্যের ক্ষমতা থেকে গেল, তখন সিস্টেমের পক্ষে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির চাপ নেবার মতো জায়গায় ছিল না।

কিন্তু ব্রাত্য বসু বা পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা এই জায়গায় ভুল করলেন। পূর্ত, সেচ, নগর বা জনস্বাস্থ্য তখনও চাপ নেবার মতো জায়গায় ছিল। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা ইলাস্টিক লিমিটের (পদার্থবিদ্যার হুক্স ল) কাছাকাছি এসে গেছে, সেটা বুঝতে পারেনি বা বোঝার চেষ্টা করেননি তৃণমূল সুপ্রিমো এবং তার পারিষদরা। ১৯৭৭-এ শিক্ষাব্যবস্থার যে ধকল নেবার ক্ষমতা ছিল, ২০১১-তে যে সেটা নেই সেটা তারা বুঝতে চায়নি। তাই চিকিৎসা না করে, শরীরের উপর অত্যাচার আরও বাড়ালো তারা।

তৃণমূলের ক্ষেত্রে মার্কেটিং পার্টির প্রচার ব্যাপারটা পুরোটাই আবেগে। কোনো স্থায়ী মস্তিষ্ক প্রক্ষালন প্রয়োজন নেই। ফেল কড়ি মাখো তেল। দুর্নীতি ও স্বজনপোষণকেই হাতিয়ার করে এগোনো শুরু হলো। প্রথমে তারা স্কুল, কলেজ নির্বাচন বন্ধ করে অ্যাডহক কমিটি বানালো। এর মধ্যে অসৎ বামশিক্ষকদের বড়ো অংশ তৃণমূলে যোগ দেয়। কিছু সৎ ও আদর্শবাদী শিক্ষক বামদিকেই থেকে যান। বেছে বেছে নতুনদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কমিটির মাথায় বসায় সরকার। এখানে উল্লেখ্য, আশি ও নব্বইয়ের দশকে শিবপুর, আরজিকর, নীলরতনে ছাত্রপরিষদ ক্ষমতায় ছিল এবং সেই ইউনিয়নের বহু ছাত্র বিভিন্ন আইআইটি এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ পড়াচ্ছেন। যদি সুগত বসুকে রাজ্য নিয়ে আসতে পারেন, তবে তাঁদেরও আনতে পারতেন। মমতা ব্যানার্জি, সুব্রত মুখার্জি, তাপস রায় বা বৈশ্বানর চ্যাটার্জিরা তো ছাত্র পরিষদ থেকেই এসেছেন। তাঁদের খুঁজে না বের করে মানিক, সুবীরেশদের কেন দায়িত্ব দিলেন? কারণ উদ্দেশ্যই ছিল নেতিবাচক। এরা কীভাবে শেষ পেরেকটা পুঁতলেন সেটা নিয়ে বিস্তারে আলোচনা হোক।

প্রথমে আসি উচ্চশিক্ষায়। (১) কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন কমিটিকে দুর্নীতিতে সম্পূর্ণ ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হয়। চলে লুট। শুধু টেট নয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও নিয়োগে চূড়ান্ত দুর্নীতি চলে। অযোগ্য শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি অনীহা নিয়ে আসে। কমিটিতে এমন কিছু রাজনৈতিক ফড়ে আসে যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজমুখো হতে ভয় পায়।

(২) চাহিদা ও জোগান ভারসাম্যর পরিবর্তন ঘটে খুব তাড়াতাড়ি। ২০১৩-তে ব্রাত্য বসু ঠিক করেন অনার্স কোর্সে অনলাইন ভর্তি হবে। সেই সময় অসমর্থিত সূত্র অনুযায়ী, কলকাতার বিভিন্ন কলেজে অনার্স পেতে ৩০ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকা দক্ষিণা বিভিন্ন ছাত্রনেতাদের দিতে হতো। কিন্তু ২০২২-এ সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু কলেজে বহু আসন খালি রয়ে গেল। কারণ ছাত্রদের মনে হয়েছে এই বিষয়গুলি নিয়ে পড়াশোনা করে কোনো লাভ নেই। কলেজে শিক্ষক নেই, মূল্যায়ন পদ্ধতি ভুল, পাশ করে সৎভাবে চাকরি পাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ। বিএড পড়তে প্রচুর টাকা খরচ এবং তারপর চাকরি পেতে আরও বেশি। তাহলে কেন 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' পার করা? দ্বিতীয় রাস্তা ১০ হাজার টাকার অস্থায়ী চাকরি। তার জন্য এমএ আর অষ্টম শ্রেণী দুই-ই সমান। তাহলে কেন ডিগ্রির পিছনে শুধু শুধু অর্থ ও সময়ের অপচয়?

(৩) বহুদিন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬০ থেকে ৬৫, তারপর ৬৮। যাতে নতুন বেতন ও পেনশন একসঙ্গে না দিতে হয়। কিন্তু সমস্যা হলো দুটো। প্রথমত, নতুন প্রজন্ম জেনে গেল সরকার শিক্ষক নিয়োগে আগ্রহী নয়। ফলে উচ্চশিক্ষা নিয়ে লাভ নেই। দ্বিতীয়ত, নতুন খোলা হাওয়া শিক্ষা জগতে প্রবেশ করা বন্ধ হলো। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝলো এখানে পড়াশোনা করে নতুন কিছু শেখা যাবে না।

এবার আসি স্কুল শিক্ষায়। প্রথমত, তৃণমূল সরকারের ধারণা প্রাথমিকে অ, আ ক, খ পড়ানো হয় এবং সেই শিক্ষা যে কেউ দিতে পারে। মধ্যবিত্তদের বড়ো অংশ বেসরকারি স্কুলে চলে গেছে। ফলে প্রথম প্রজন্ম পড়তে আসা বাচ্চা ও তাঁদের বাবা-মা শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন করবে না। তারা মিড ডে মিল পেলেই খুশি থাকবে। তাই সেরা শিক্ষক নিয়োগ করে কী হবে! বরং সেরা শিক্ষক নিয়োগের বদলে অযোগ্য নিয়োগ করে পার্টি ফান্ড একটু মজবুত করা যাক।

দ্বিতীয়ত, যারা চাকরি পেল তাঁদের অধিকাংশই ছোটো বা বড়ো শহরের। প্রত্যেকেই চাকরি পেয়েই বদলির চেষ্টা শুরু করলো। শুরু হলো অর্থ উপার্জনের নতুন রাস্তা। গ্রামের স্কুলে পড়ুয়া বেশি, কিন্তু শিক্ষকরা পড়াতে রাজি নয়। আর শহরে ঠিক উলটো। কিন্তু এখানেও চাহিদা ও জোগানের কথা না ভেবে গ্রামের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি করা হলো। ভেঙে পড়লো গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন পঞ্চায়েত স্কুলে নতুন নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেল। এই ধরনের স্কুলে শিক্ষার মূল্যায়ন একেবারে নেই বললেই চলে। পঞ্চায়েত সম্ভবত এমন এক ব্যতিক্রমী দপ্তর যেখানে তৃণমূল সরকার অনেকটা সফল। সড়ক থেকে বিভিন্ন পরিষেবা খারাপ দেয়নি। তাতে ভোটও এসেছে। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারটায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল এই দপ্তর। ফলে পড়ুয়া কমতে কমতে পঞ্চায়েত শিক্ষাব্যবস্থা একদম শূন্যের কাছাকাছি।

চতুর্থত, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও দুর্নীতি। স্কুল কমিটি সর্ব শিক্ষা মিশন-সহ বিভিন্ন খাতে খরচ এমনভাবে করে যাতে ঠিকাদারদের পকেট ভরে। এদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নেই। তার মধ্যে যারা রাজনৈতিক দাদা ধরে গত বারোবছর চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের দাপটে বাকিদের অবস্থা বেশ খারাপ। পরিবেশ যদি বিদ্যালয়সুলভ না হয়, কে শিক্ষা দেবে, আর কে নেবে?

শিক্ষার পরিবেশ কতটা খারাপ সেটা বুঝতে গেলে দুটি সমীক্ষাই যথেষ্ট। আজকের দিনে কতজন সরকারি স্কুলের শিক্ষক তার সন্তানকে সরকারি স্কুলে পড়ায়? যারা বদলি চেয়ে শহরে চলে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে যদি সমীক্ষা করা হয়, তারাও বলবেন যে 'গ্রামে ভালো স্কুল নেই'। অথচ এই রাজ্যে আশির দশকের প্রথম পর্যন্ত সরকারি ক্লাস ওয়ান আধিকারিকরা ছেলে-মেয়েদের বাংলা স্কুলে পড়িয়েছেন।

সমাধান কী? সাধারণ ঘা হলে অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ হয়। কিন্তু গ্যাংগ্রিন হলে তাকে উপড়ে ফেলতে হয়। সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি প্রয়োজন। নতুন ব্যবস্থা, নতুন সিলেবাস, নতুন শিক্ষক, নতুন শিক্ষক, প্রশিক্ষণ ও সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বস্তরে দায়বদ্ধতা বাড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু সামাজিক সচেতনতা অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের অপ্রতুলতা আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যও আমাদের প্রয়োজন। মানুষকে বুঝতে হবে যে শিক্ষাই একমাত্র রাস্তা যা আমাদের দারিদ্র্যমুক্তি দিতে পারে। বহু শতক পরাধীনতার পর মাত্র সাতদশকে ভারতবর্ষ পৃথিবীর পঞ্চম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে ভারতবাসীর শিক্ষার জন্যই। পশ্চিমবঙ্গকেও সেই পথেই মুক্তির রাস্তা খুঁজতে হবে। অন্য কোনো পথ নেই।

(লেখক বহুজাতিক প্রযুক্তি ও বাণিজ্যবিষয়ক পরামর্শদাতা সংস্থা ইউআরএস ইন্ডিয়ার ভূতপূর্ব চিফ জেনারেল ম্যানেজার এবং বর্তমানে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি প্রকল্পের পরামর্শদাতা)

নোটবাতিলে দেশের অর্থনীতি দুর্নীতিহীন হয়ে বেগবান ও প্রাণবন্ত হচ্ছে

ড. বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়

নোটবাতিলের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল জালনোট অর্থনীতি থেকে তুলে নির্মূল করা যার বেশিটাই সন্ত্রাসবাদী তহবিলে ব্যবহৃত হয়। উচ্চমূল্যের জাল ভারতীয় নোটের প্রচলনে অনেক ক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদী দলের সংযোগ প্রমাণিত হয়েছে। ২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২ সময়কালে প্রতি ১০ লক্ষ পিস প্রচলিত নোটের ৯.৭ থেকে ১৮.২ শতাংশ চিহ্নিত করা যেত গড়পড়তা ভাবে জালনোট হিসেবে যা মোটামুটি প্রতি ১০ লক্ষ পিসের মূল্যমানে ছিল ১৬.৪ শতাংশ। একটি হিসেব অনুযায়ী, ভারতে জালনোটের মোট মূল্য ছিল নোটবাতিল পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ সালে ৩.৬১ বিলিয়ন টাকা।

নোটবাতিল সত্ত্বেও ইক্যুইটি আগমনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ২০১৬-১৭ সালে ৯ শতাংশ বেড়ে ৪৩.৪৮ বিলিয়ন ডলার হয়েছিল যা ২০১৫-১৬ সালে ছিল ৪০ বিলিয়ন ডলার এবং প্রথম হিসেবটি ছিল একটি নির্দিষ্ট বছরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ। ইক্যুইটির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হলো দেশের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক বৃদ্ধি ও উন্নতির সূচক। ফলত, এরূপভাবে প্রাপ্ত বেশি প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশের দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক সুফলেরও পরিমাপক। নোট বাতিল পরবর্তী সময়ে ভারত ইক্যুইটির আকারে অনেক বেশি বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment বা FDI) আকর্ষণ করেছে। ইক্যুইটির অন্তঃপ্রবেশ ২০১৬-১৭ সালে ছিল ৫.৯০ বিলিয়ন ইউএস ডলার যা ২০১৫-১৬ সালের ৩.৫৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে ছিল ৬৫ শতাংশ বেশি। যেখানে এফডিআই ইক্যুইটির অন্তঃপ্রবেশ নোটবাতিল পূর্ববর্তী ছ' মাসে, এপ্রিল-অক্টোবর (২০১৬) ছিল ২.৭৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা ছিল মোট ইক্যুইটি বিনিয়োগের ৪৭ শতাংশ, সেখানে নোট বাতিল পরবর্তী পাঁচ মাসে, নভেম্বর ২০১৬, মার্চ, ২০১৭ এই অন্তঃপ্রবেশ ছিল ৩.১২ বিলিয়ন ইউএস ডলার যা ছিল মোট ইক্যুইটি বিনিয়োগের ৫৩ শতাংশ। এটি চিরন্তন তত্ত্বকে সমর্থন করে যে দুর্নীতি বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণে এফডিআই-এর অন্তঃপ্রবেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উৎপাদন ক্ষেত্রে

এফডিআই ইক্যুইটির অন্তঃপ্রবেশ ২০১৬-১৭ সালে ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ১৩.৩৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০.২৬ বিলিয়ন ডলারে। পাশাপাশি, মোট এফডিআই অন্তঃপ্রবেশ ২০১৬-১৭ সালে ৮ শতাংশ বেড়ে হয়েছিল ৬০.০৮ বিলিয়ন ডলারে যা ছিল কোনো একটি আর্থিক বছরে এফডিআই-এর সর্বোচ্চ বৃদ্ধি।

নোট বাতিল একটি মানসিক জোর স্থাপন করেছিল যদিও প্রত্যক্ষ কারণ ছিল এক্ষেত্রে কর নীতির সংস্কার এবং সহজে ব্যবসা করার নীতির (ease of doing business) উন্নয়ন।

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনাজনিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের উপর নোট বাতিলের প্রভাব বিষয়ে কর্ণাটক রাজ্যের টুমকুর জেলার গুব্বি তালুকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। সেখানে ব্যাংক আধিকারিকদের ৬৭ শতাংশ, মূল্যবান অলংকার বিক্রেতাদের ৫০ শতাংশ, স্থায়ী খুচরো দ্রব্য বিক্রেতাদের ১০০ শতাংশ, অস্থায়ী খুচরো দ্রব্য বিক্রেতাদের ২৫ শতাংশ, তাঁতিদের ৭১ শতাংশ এবং ভোক্তাদের ৫১ শতাংশ নোটবাতিলের পক্ষে মনোভাব জানিয়েছিল। অর্থাৎ সার্বিকভাবে জনগণ নোটবাতিলের পক্ষে সদর্থক সমর্থন জানিয়েছিল। ওই একই সমীক্ষায় ৮৩ শতাংশ মানুষ চেয়েছে কালোটাকার নিরাময় ও দুর্নীতি দূর করতে, যেখানে ৫২ শতাংশ মানুষ চেয়েছে জালনোট আটকে ডিজিটাইজেশনের দিকে এগোতে। অন্যদিকে, ৯৪ শতাংশ মানুষ চেয়েছে আগস্ট, ২০১৭-এর মধ্যে ভোগের পুরনো ধরনে ফিরতে আর ৫৪ শতাংশ চেয়েছে স্থায়ীভাবে ভোগের ধরনের পরিবর্তন। পাশাপাশি, ১০০ শতাংশ মানুষই চেয়েছে লেন-দেনের ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার চালিয়ে যেতে যার মধ্যে ডিজিটাল ওয়ালেটের পছন্দ ৬৮ শতাংশ মানুষের, যেখানে ডেবিট কার্ডের ব্যবহার পছন্দ করেন ৬৩ শতাংশ, অনলাইন ব্যাংকিং পছন্দ ৪০ শতাংশ মানুষের এবং ডিজিটাল লেন-দেনের বর্ধিত ব্যবহার চেয়েছেন ৮৩ শতাংশ মানুষ। মোটামুটি একে সমগ্র ভারতের গ্রামাঞ্চলের ছবি হিসেবে ধরা যেতে পারে। যারা নোটবাতিলের সদর্থক প্রভাবের দিকে ভোট দিয়েছেন তাদের ৪২ শতাংশ মনে করেন একটি দুর্নীতিহীন ও বিস্তারিত কর ব্যবস্থা বহুসংখ্যক কর ফাঁকি দেওয়া মানুষকে এর আওতায় নিয়ে আসতে পারবে।

লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নোট বাতিলকে অর্থনীতি পরিষ্কার করার প্রচেষ্টা জনিত কষ্ট বলে মেনে নিয়েছে এবং যার জন্য এটিএমগুলির সামনে জনগণের লম্বা লাইন দেখা গেছে যাকে 'ভালো কিছুর জন্য কষ্ট সওয়া' (suffering for a good cause) বলে অভিহিত করা হয়েছে। নতুন নোট নেবার জন্য এটিএম-এর সামনে জনগণের লম্বা লাইনকে দুর্নীতি ও কালোটাকার বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইতে জনগণের 'প্রতীকী অংশগ্রহণ' (symbolic participation) বলে মনে করা হয়েছে। কমপক্ষে অর্ধেকেরও বেশি সংসদীয় কেন্দ্রে সি-ভোটার সমীক্ষার দ্বারা জনমত যাচাই করা হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে যে ৮৬ শতাংশ সাড়া দেওয়া বা অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি জানিয়েছে নোটবাতিলজনিত কষ্ট বা অসুবিধা কালোটাকার বিরুদ্ধে লড়াইকে দামি বা প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। উচ্চ আয় সম্পন্ন শ্রেণীর কাছ থেকেই এসেছে সর্বাধিক ৯০.৬ শতাংশ সমর্থন নোট বাতিলের প্রতি। প্রায় ৮৬ শতাংশ গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সাড়া দেওয়া জনগণ অনুভব করেছিল যে, নোট বাতিলজনিত অসুবিধাগুলি দীর্ঘকালের জন্য উপকারী হবে। 'অসুবিধা তত্ত্ব' (inconvenience theory) নিয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিতর্কের বিপরীতে ৭১ শতাংশ শহরাঞ্চলের, ৬৫ শতাংশ আধা-শহরাঞ্চলের এবং ৫৯.৪ শতাংশ গ্রামাঞ্চলের সাড়া দেওয়া ব্যক্তিরা অনুভব করেছে যে নোটবাতিল কার্যক্রম রূপায়িত হয়েছে একটি সক্ষম উপায়ে (efficient manner)। ফলে সাধারণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত যেখানে ছিল যে অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র (informal sector) এবং তাঁর কর্মীরা নোট বাতিলে ভয়ংকর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে সি-ভোটার মতামত সমীক্ষা দেখিয়েছে ৬৬.২ শতাংশ সাড়া দেওয়া, মূলত নিম্ন আয়স্তরের ব্যক্তি, লক্ষ্য করেছিল যে নোটবাতিল একটি ভালো পদক্ষেপ যা ভালোভাবেই রূপায়িত হয়েছে (good step and well implemented)। ৮০ শতাংশের বেশি সাড়া দেওয়া ব্যক্তিরা নোট বাতিলজনিত অসুবিধাতে কিছু মনে করেননি বা মানিয়ে নিয়েছেন। এই মতামতগুলিকে কালোটাকার বিরুদ্ধে জনগণের গোপন বা লুক্কায়িত মনোভাব (suppressed sentiment) বলে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী যথার্থভাবেই নোট বাতিলকে বর্ণিত করেছেন সরকারি প্রচেষ্টার অতিরিক্ত কিছু, যা একটি সমবেত জাতিগঠনে উদ্যোগ (a collective nation building exercise) এবং যা দেশকে পরিশুদ্ধ করে তুলবে। (movement for purifying the country)।

পাঁচটি গবেষণা মতের ভিত্তিতে দেখা গেছে (ক) ২০১৬-তে করা নোটবাতিল প্রচেষ্টা বহু সন্দেহজনক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সন্ধান দিয়েছে যা Operation Clean money (OCM) প্রকল্পের সাফল্য। প্রকৃতপক্ষে, OCM প্রকল্পের সাফল্য নোট বাতিলের সাফল্যের

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

মাপকাঠি হিসেবে ধরা উচিত। কালোটাকার চিহ্নিতকরণ নোটবাতিল পরবর্তী OCM ব্যবস্থায় অতি গুরুত্বপূর্ণ। শেল কোম্পানিগুলি ও তাদের পরিচালকদের চিহ্নিতকরণেও এটি অত্যন্ত সাহায্য করেছিল। (খ) নোটবাতিল ও তার অনুসরকণকারী OCM প্রকল্প দেশের স্বল্প কর— জিডিপি অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে কর সংগ্রহ বাড়াতে অবদান রেখেছিল। (গ) নোটবাতিল বড়ো অঙ্কের নোটের প্রচলন হ্রাস করে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার পুনর্গঠনে (reorganisation) সাহায্য করেছে। এটি আরও কমে যেত তিন বছরের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে করোনা মহামারী চলে না এলে এবং তার জন্য সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে সরকারকে প্রভূত অর্থ বরাদ্দ ও খরচ করতে না হলে। (ঘ) যদিও হয় রাজস্ব অথবা রাজস্ব ও মুনাফা উভয়ই হ্রাসের দ্বারা নোট বাতিল দেশের ১২টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে, তবুও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অন্তঃপ্রবেশ, ২০১৬-র দ্বিতীয় পর্বে, যার মধ্যে নোটবাতিল পর্ব পড়েছিল, বেড়েছিল ওই বছরের প্রথম পর্বের (প্রথম ৬ মাস বা জানুয়ারি থেকে জুন) সময়ের তুলনায়। এফডিআই ইক্যুইটির অন্তঃপ্রবেশ ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ২০১৬-১৭ সালে ৬৫ শতাংশ বেড়েছিল।

কোনো সন্দেহ নেই যে দেশ এগোচ্ছে, শুধু ডিজিটাল লেন-দেনে নয়, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রের আর্থিক লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ এনে। কোনো সন্দেহ নেই দেশের অর্থনীতি আজ অনেকটাই দুর্নীতিহীন হয়ে ক্রমশ প্রাণবন্ত ও বেগবান হচ্ছে।

যাইহোক, নোটবাতিলের চূড়ান্ত সাফল্য দেখা উচিত OCM-এর মাধ্যমে অসঙ্গতিপূর্ণ আমানত জমা তথ্যের খোঁজ পাওয়ার (data discoveries) এবং কালোটাকার মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রদর্শনে। দীর্ঘকালে এগুলি দুর্নীতির মনোভাব কমানো, মূলধনের প্রবাহকে ভালো করা এবং কর-জিডিপি অনুপাত বাড়াতে সাহায্য করবে। নোটবাতিল অর্থনীতিতে নোটের জোগান কমিয়েছে কিন্তু OECD দেশগুলির গড় মুদ্রা-জিডিপি অনুপাত লাভ করা নির্ভর করবে ডিজিটাল লেন-দেন বাড়ানোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার উপর। ভারতের কর-জিডিপি অনুপাত, যা প্রায় ১৮ শতাংশ হলো বিশ্বের মধ্যে অন্যতম কম। কারণ হলো, যা ২০১৭-১৮ কেন্দ্রীয় বাজেটেও উল্লেখিত হয়েছে, ভারত মূলত ছিল একটি কর না-প্রদানকারী (non-compliant) দেশ এবং কর ফাঁকি আর দুর্নীতি হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুটি বড়ো প্রতিবন্ধকতা। নোটবাতিল হলো সৎ কর ব্যবস্থা, উন্নত কর সংগ্রহ এবং ঋণের উপর স্বল্প নির্ভরশীলতা নিশ্চিত করা।

৮ নভেম্বর ২০১৬, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত নোটবাতিল হলো একটি অনন্য অভিজ্ঞতা যা প্রমাণ করেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতির ভীতি মোকাবিলা করার ব্যাপারে আন্তরিক। দুর্নীতি রোধের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী নীতির প্রতিষেধক (deterrence) যা নির্ভর করে কার্যকরী প্রশাসন এবং কৃৎকৌশল (technology) ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও নিরূপণের উপর যা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্ম দেয় (actionable intelligence)। দুর্নীতি সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয় (undermines government's ability) এবং বহুসংখ্যক পরিবর্তনশীল নির্ণায়ককে বড়োরকম ক্ষতিগ্রস্ত করে (adversely affects), যেমন সমষ্টিগত আর্থিক স্থিরতা (macro financial ability), বিনিয়োগ, মানবসম্পদ গঠন এবং উৎপাদনশীলতা প্রভৃতি। এটি সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ ক্ষমতা কমিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কর ফাঁকি ও অভিযোগের সংস্কৃতি (culture of complaints) আমদানি করে। এর সঙ্গে এটি সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থার খরচ বৃদ্ধি করে এবং এর মান হ্রাস করে। এর ফলে সরকারি নীতির প্রতি অবিশ্বাস জন্মায় এবং যদি তা ব্যাপক হয়, তবে আর্থিক দূরদৃষ্টি দুর্বল হয় এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ-সহ উন্নয়ন (inclusive growth) ব্যাহত হয়। তাই সমষ্টিগত অর্থনীতিক স্থায়িত্ব এবং স্বয়ংপোষিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর দুর্নীতির গভীর প্রভাব আছে।

কালো বা ছায়া অর্থনীতি সাদা অর্থনীতির পাশাপাশি থাকে এবং উভয়ের মধ্যে অসংখ্য অবশ্যম্ভাবী সংযোগ (numerous inevitable linkage) গড়ে ওঠে। সেই কারণে কালোটাকার সঠিক পরিমাপ বিষয়ে সংখ্যা ও তথ্যে অনেক প্রভেদ ঘটে (আমাদের দেশে যা প্রায় ৬ থেকে ৪২ শতাংশ)। তাই সহজেই বলা যায় নোটবাতিলপূর্ব পর্বে ভারত ছিল একটি কর অপ্রদানকারী দেশ।

নোটবাতিল পরবর্তী অগ্রগতি হিসেবে বলা যায় যে, ভারতে হিসেবি বহির্ভূত (unaccounted income) আয় সরকারি হিসেবে ১২.২ শতাংশ হওয়ায় ভারতের নগদ-জিডিপি অনুপাত একইরকম অনেক দেশের থেকে বেশি, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা (৩.৯ শতাংশ), ব্রাজিল (৪.১ শতাংশ) এবং মেক্সিকো (৫.৭ শতাংশ)। ভারত নোট প্রচলনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক ও ভোক্তা যা ২০১১-১৬ এই পাঁচ বছরে প্রায় ৪০ শতাংশ বেড়ে ৬৪.৫৮ বিলিয়ন থেকে ৯০.২৭ বিলিয়ন হয়েছে (মুদ্রামূল্যে)। নোটবাতিল পরবর্তী পর্বে তা ক্রমশ কমানোর চেষ্টা চলছে ডিজিটাল লেন-দেন প্রসারের মাধ্যমে। সংগঠিত ক্ষেত্রে এর প্রসার উৎসাহজনক, কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের বিস্তীর্ণ অসংগঠিত ক্ষেত্রকে নিয়ে যা অর্থনীতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে। যাইহোক, কোনো সন্দেহ নেই যে দেশ এগোচ্ছে, শুধু ডিজিটাল লেন-দেনে নয়, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রের আর্থিক লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ এনে। কোনো সন্দেহ নেই দেশের অর্থনীতি আজ অনেকটাই দুর্নীতিহীন হয়ে ক্রমশ প্রাণবন্ত ও বেগবান হচ্ছে।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)

তিন রাজ্যের নির্বাচনে মুখ পুড়ল তৃণমূল কংগ্রেসের

বিশ্বপ্রিয় দাস

এটা কি শেষের শুরু, না শুরুর শেষ? কেন এই কথা দিয়ে লেখা শুরু হলো, সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করা একান্তই দরকার বলে মনে হয়। অনেক আশা নিয়ে দেশের তিন রাজ্যে নির্বাচনী লড়াইয়ে সাগরদিঘির উপনির্বাচনে লড়তে নেমেছিল পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। লক্ষ্য ছিল নিজের রাজ্যের উপনির্বাচনে একটা সম্মানজনক মার্জিনে জয়লাভ করা। আর যে করেই হোক ভিন রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে সেই রাজ্যের রাজ্যপাট সামলানো অথবা নিদেনপক্ষে প্রধান বিরোধী দল হয়ে ওঠা।

এটার পিছনে অবশ্য একটা প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। সামনের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলকে অক্সিজেন দিয়ে চাঙ্গা করে নির্বাচনী ময়দানে জয়লাভ করা। আর দ্বিতীয়টি হলো ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের জন্য সর্বভারতীয় একটা ইমেজ তৈরি করে সারা দেশে বিরোধী ঐক্যের নেতৃত্ব দেওয়া। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তৃণমূল সুপ্রিমো সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছিলেন। তিন রাজ্যের ভোটাররা অবাক হয়ে দেখেছেন তৃণমূলের প্রচার কৌশল ও খরচের বহর। এমনকী এই নির্বাচনে ভোট কৌশলী পি কে-কেও ব্যবহার করতে পিছপা হননি তিনি।

তারপরেও বাস্তবটা যে এমন হবে কল্পনাতে আনতে পারেনি তৃণমূল নেতৃত্ব সমেত স্বয়ং সুপ্রিমো। নিজের রাজ্যে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির উপনির্বাচনে যেমন গোহারা হারতে হয়েছে কংগ্রেস- বামজোটের প্রার্থী বায়রন বিশ্বাসের কাছে, তেমনি ভিন রাজ্য ত্রিপুরা বা মেঘালয়েও হয়েছে ভরাডুবি। নাগাল্যান্ডের ফলাফল অবশ্য জানাই ছিল কী হবে। যাদের বিরুদ্ধে লড়াই সেই বিজেপি ওই তিন রাজ্যে সফলতার মুখ দেখছে। সেখানেই রাজনৈতিক ভাবে এক প্রবল ধাক্কার মুখোমুখি তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে বিজেপি বা রাজ্যে অন্য বিরোধী দলগুলি ২০১৪-এর লোকসভার নির্বাচনের সেমি ফাইনালে যে কয়েক কদম এগিয়ে গেল, সেটা অতি বড়ো রাজনৈতিক গবেষকরাও অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছেন। এদিকে তৃণমূল ক্রমেই যে তাদের জনপ্রিয়তা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে হারাতে পিছু হঠতে শুরু করেছে, সেটার প্রমাণ এই ফলাফল।

আমাদের রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম পাখির চোখ ছিল মেঘালয়। সেখানে বিধায়ক ভাঙানো থেকে শুরু করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমার নেতৃত্বে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিল। নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজি ঠিক করার দায়িত্ব তৃণমূল নেত্রী দিয়েছিলেন ভোট কৌশলী প্রশান্ত কিশোরের হাতে। অন্যদিকে পিকে-র মোকাবিলা করতে কারনাডরা নামিয়েছিলেন আইআইটি-র প্রাক্তনী অনন্ত তিওয়ারিকে। এই রাজ্যে পি কে যে ডাহা ফেল, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন অনন্ত। এন পি পি-র সাজানো ঘুঁটি বুঝতেই পারেনি পিকে-র টিম। আর অনন্ত এনপিপি-র ঝুলিতে অতিরিক্ত ৬টি আসন দিয়ে সরকার গড়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে দিল। আর তৃণমূল কংগ্রেসের স্বপ্ন মাঠে মারা গেল। মেঘালয়ের প্রাক্তন শাসক দলের টালমাটাল অবস্থা দেখে একটা সুযোগ নিয়েছিল তৃণমূল। আর প্রচারে অকাতরে টাকা ঢেলেছিল। এমনকী ক্ষমতায় এলে একাধিক ভাতা-সহ নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েও ভোটারদের মনের গভীরে পৌঁছতে ব্যর্থ হলো। ভোটাররাও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা দেখে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চায়নি। মাত্র ৫টি আসন তৃণমূলের ঝুলিতে। তৃণমূল সুপ্রিমো অবশ্য এটাকে নেই মামার চেয়ে, কানা মামা বলাই ভালো বলে মনে করেছেন।

ত্রিপুরার মাটি কামড়ে পড়েছিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এই বিধানসভা নির্বাচনে বিশেষ পর্যবেক্ষকের ক্ষমতা। এই রাজ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা পেয়েছে বিজেপি। এক নজরে ত্রিপুরার ফলাফল দেখে নেওয়া যাক। বিজেপি-৩২ (যেখানে সরকার গড়তে দরকার ৩১টি আসন) বামেরা পেয়েছে ১১টি, কংগ্রেস—৩টি, তিপ্রা মথা—১৩টি, অন্যান্য—১টি। এখানে তৃণমূলের ভাঁড়ারে শূন্য।

এখানে লক্ষণীয় তিপ্রা মথা একটি নতুন দল। তারা প্রায় ২১ শতাংশ ভোটের অংশীদার। অথচ প্রচার থেকে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েও তৃণমূল কেন এত কম ভোট পেল? সেটা রাজনৈতিক মহলের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তারা মনে করছেন, এই রাজ্য অনেকটাই রাজনীতিক ভাবে সচেতন। বামেরা গতবারের চেয়ে তারা ৫টি আসন কম পেয়েছে। গতবার ছিল ১৬, এবার ১১। ত্রিপুরার বাঙ্গালিরা যে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলকে একটুও জায়গা দেবে না, সেটা তারা এই নির্বাচনে বুঝিয়ে দিয়েছে। আর এটাও বুঝিয়ে দিয়েছে, যে তারা বিজেপি-তেই আস্থা রেখেছে।

একটিই কারণ, নরেন্দ্র মোদীর দেশ পরিচালনা। আর সারা ভারতের অর্থনৈতিক সুস্থিরতা থেকে প্রগতির পথে যাত্রা। সেখানে পশ্চিমবঙ্গকে রোল মডেল ধরলে দুর্নীতি, অনুন্নয়ন (শিল্প সমেত সবক্ষেত্রে), শিক্ষা ক্ষেত্র সমেত সব জায়গায় পিছিয়ে পড়া বিষয়টাকে ভোটাররা গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছে। তার ফলাফল প্রতিফলিত ভোট বাক্সে।

নাগাল্যান্ডে ফলাফল মোটমুটি কী হবে জানা ছিলই। তাই এটা নিয়ে মাথা ঘামালেও তৃণমূল নেতৃত্ব ভালো ফলের আশা করেনি। এখানে আগের শাসক দল ক্ষমতায় আসছে। অর্থাৎ এনডিপিপি- বিজেপি জোট ক্ষমতায় এসেছে। আবার রিয়োই মুখ্যমন্ত্রী।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই তিন রাজ্যের জয়কে নিয়ে কারণ হিসেবে ত্রিবেণীর উল্লেখ করেছেন, (১) সরকারের কাজ, (২) সরকারের কর্মসংস্কৃতি, (৩) বিজেপি সরকারের কর্মী থেকে সরকারের মানুষের প্রতি নিবেদিত দায়বদ্ধতা।

রাজ্যে উপনির্বাচনেও মুখ পুড়েছে রাজ্যের শাসক দলের। সাগরদিঘি কেন্দ্রে জিতেছে কংগ্রেস। আর শাসক দলের দিক থেকে যে মুসলমান ভোট যে সরে গেছে, সেটাও প্রমাণ হয়ে গেল। রাজ্যে কংগ্রেস ও বাম জোটের খাতা খুলল। এটাকে সবাই এক বাক্যে বলতে শুরু করেছে রাজ্যে পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে বিকল্প শক্তি প্রস্তুত, সেটা জনমানসে সূচনা হয়ে গিয়েছে। আর এই সঙ্গে বলছে, রাজ্যের শাসক দলের বিদায় ঘণ্টাও বাজা শুরু হয়ে গেল। □

গ্রামের মানুষ দিদির সঙ্গে নেই

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর তৃণমূল কংগ্রেস দল নতুন কৌশল অবলম্বন করে গ্রামের মানুষের কাছে পঞ্চায়েত ভোটে জয় আনার জন্য 'দিদির দূত' নামকরণ করে নতুন গিমিক সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু গ্রামের মানুষেরা বোকা নয়। গ্রামের মানুষেরা আর দিদির সঙ্গে নেই। দিদির ধোঁকাবাজিতে তারা আর ভুলবে না। বিগত কয়েকটি পঞ্চায়েত ভোটে শাসকদল গ্রামের মানুষের কাছে অনেক বাজে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রামের মানুষদের বোকা বানিয়েছে।

সাইকেল, মোবাইল ইত্যাদি দিয়ে সরাসরি কোটি কোটি টাকা লুঠ করে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থাকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। মাসে মাসে পাঁচশো টাকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এও একটি রাজনৈতিক চমক তা গ্রামের মানুষ ও শহরের জনগণ খুব ভালো ভাবেই এখন উপলব্ধি করছেন। ভাঁড়ার এখন শূন্য। তাই সরকারের অধীনস্থ কর্মচারীদের তাদের প্রাপ্য মূল্য ডিএ দিতে সরকার অপারগ। সরকারি কর্মচারীদের তাদের প্রাপ্য টাকার জন্য আমরণ আন্দোলন করতে হয়। বাজেটে নিরুপায় হয়ে সরকার মাত্র তিন শতাংশ ডিএ ভিক্ষুকের ন্যায় ছুড়ে দিয়ে কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে মানুষকে আবার বোকা বানাবার চেষ্টা করছে।

রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের আগে মানুষের ভুরি ভুরি অভিযোগ শোনার জন্য দিদির দূত নিয়োগ করে ক্ষততে মলম লাগাবার এক অদম্য চেষ্টা করেছেন। গ্রামের মানুষেরা এই দিদির দূতকে ঝাঁটা মেরে গ্রামের বাইরে বের করে দিয়ে ঠিক জবাব দিয়েছেন। মানুষের উগরে দেওয়া ক্ষোভকে আর মিষ্টি কথায় সামাল দিতে পারেনি। আজ মানুষের মধ্যে জেগে ওঠা ক্ষোভকে সামাল দিতে সরকারের প্রশাসন লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস দিয়ে প্রতিরোধ করতে পারেনি। গ্রামের মানুষেরা আর দিদির সঙ্গে নেই। দুর্নীতি ঢাকতে এখন আর হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে কোনো লাভ নেই।

—**সঞ্জয় ব্যানার্জি,**
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

আক্রমণ খাদ্যাভ্যাসে

হিন্দুদের অবচেতনে তাদের খাদ্যাভ্যাসে আক্রমণ ঘটেছে খ্রিস্টীয় এবং মুসলমানদের খাদ্যাভ্যাসের। এই দু' ধর্মের খাদ্যাভ্যাস হিন্দুত্বের হাঁড়ি, কড়াই থেকে শুরু করে মস্তিষ্কে এবং হৃদয়ে ফুড জিহাদের জয়ধ্বজা ইতিমধ্যে উড়িয়ে দিয়েছে। এর থেকে নিষ্কৃতির শর্টকাট পদ্ধতি এখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। আগামীতে এই ফুড জিহাদ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। সংগঠিত হিন্দুশক্তি যদি তাদের জিভকে এখনই নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে আগামীতে হিন্দু খাদ্য অভ্যাস ফসিল হতে বাধ্য, এটা বোঝার জন্য কোনো সমাজ বিজ্ঞানী হবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হিন্দুত্বের প্রতি ভালোবাসা, আবেগ এবং টানা একটা কথা পরিষ্কার হিন্দুত্বের খাদ্যাভ্যাসে আক্রমণ শানিয়েছে মোগলাই এবং বিরিয়ানির মতো মুসলমান খাবার। অপরদিকে ব্রেড, রোল, চাওমিনের মতো খ্রিস্টীয় খাদ্যকে আপন করে নিয়েছে হিন্দুধর্ম অবলম্বনকারীরা। হিন্দুদের অগোচরে হিন্দুদের অবচেতন মনেই মুসলমান খাদ্য অভ্যাসে এবং খ্রিস্টীয় খাদ্য অভ্যাস চিরস্থায়ী জায়গা করে ফেলেছে। হিন্দু ভুলে গেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বনকারীদের খ্যাদাভ্যাসের কথা।

তাইতো এখন আর ঝটকা মাংস পাওয়া সত্যি দুষ্কর। চিকেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। পিঠেকে ভুলে হিন্দুসমাজ মোমোকে পরম আত্মীয় ভাবতে শুরু করেছে। পায়েসের বদলে কেক ছাড়া জন্মদিন উদ্‌যাপন করা আর লবণ ছাড়া রান্না একই বিষয়। বর্তমানে হিন্দু সমাজ খিচুড়িকে তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্য তালিকাতে কবেই অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে। চিড়ে, মুড়ি, সাবুমাখা, সুজির মতো উপাদেয় খাদ্যগুলি আজ হিন্দু সমাজের কাছে ব্যাকডেটেড খাবার হিসেবে চিহ্নিত। স্বাস্থ্য সচেতন হিন্দুসমাজ আতপ চালের ফেনা ভাতকে ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াকে অস্বাস্থ্যকর বলেই চিহ্নিত করে। অথচ পঞ্চ অমৃতের অন্যতম অমৃত ঘি—এই শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যাকে ধুলিসাৎ করবার অপপ্রচেষ্টাতে শামিল হিন্দুদেরই এক অংশ। সহজপাচ্য নিরামিষ আহার বয়কট করবার ডাক দিয়ে একাংশের হিন্দু মহান সেকুলার সাজবার চেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করতে ব্যস্ত। ধর্মীয় বিধি মেনে উপবাস করাকে কুসংস্কার তকমা দিয়ে নিজেদের এই শতাব্দীর বিজ্ঞানের পুত্র হিসেবে চিহ্নিত হতে হিন্দুদের উৎসাহিত করছে সেকুলার নামধারী হিন্দুত্ব বিরোধীরা।

এক কথায় লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদকে অতিক্রম করে ফুড জেহাদের সম্মুখীন আমরা— সম্মুখীন গোটা হিন্দু সমাজ। সনাতনী রীতিনীতি, সনাতনী খাদ্য অভ্যাসকে সমূলে উৎখাত করবার যে অপপ্রচেষ্টা চারিদিকে শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে সনাতনী হিন্দু সমাজ যদি এখনই জাগ্রত না হয় তাহলে আগামী দিন অত্যন্ত ভয়ংকর, একথা সহজ এবং সত্য। হিন্দু এবং হিন্দুত্বকে চারিদিক থেকে কোণঠাসা করে ফেলবার, আটকে ফেলবার অপচেষ্টা জারি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এই সংকট থেকে হিন্দু এবং হিন্দুত্বকে মুক্ত করতে হলে হিন্দুদেরই আরও বেশি বেশি করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নিজেদের সংগঠিত করা, ঐক্যবদ্ধ করা কোনো অপরাধ নয়।

সুতরাং সেকুলারদের কুকথা, অপচেষ্টা, চক্রান্তকে পদদলিত করে গৈরিক পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরবার যে সনাতনী দায় এবং দায়বদ্ধতা সনাতনীদের উপর ন্যস্ত হয়েছে সেই দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখেই আগামীদিনের সংগঠিত হিন্দু সমাজ যুক্তির কষ্টিপাথরে সবকিছু বিবেচনা করেই দেবভূমি ভারতের মাটিতেই গৈরিক সভ্যতাকে নতুন করে সাজিয়ে তুলবে— এটাই ভবিষ্যৎ, এটাই এই শতাব্দীর কর্মযজ্ঞ।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
বনগাঁ উত্তর ২৪ পরগনা।

ফঃ ৩

ডিএ বঞ্চনা দূর হবে কবে?

বিগত একদশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের সরকার সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে ডিএ বঞ্চনা করে চলেছে। এই নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বিস্তর অসন্তোষ। তারা বারবার দাবি করছেন তাদের বকেয়া ডিএ মেটানোর জন্য। কিন্তু এই সরকার এইসব বিষয়ে কোনো কর্ণপাত করছেন না। বরং মেলা-খেলা-লক্ষ্মীভাণ্ডার-দুর্গাপূজায় ক্লাবকে অনুদান এইসব নিয়ে ব্যস্ত। তাই সরকারি কর্মচারীরা হাইকোর্টে ও স্যাটে বকেয়া ডিএ আদায়ে মামলা করেছিলেন। ডিএ সরকারি কর্মচারীদের অধিকার। অনটনের অজুহাতে সরকার কোটি টাকা খরচ করে সুপ্রিমকোর্টে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করেছে। যাতে সরকারি কর্মচারীদের এখনই ডিএ দিতে না হয়। এই মামলার শুনানি দিনের দিন কৌশলগত ভাবে সরকারি আইনজীবীরা পিছিয়ে দিচ্ছেন। আসলে সরকার একটা পলিসি নিয়েছে। তারা সরকারের অধীনে অন্যান্য নিম্ন বেতনের কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করে নেবে অথচ তাদের ন্যায্য দাবি মেটানোর কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

তাই সরকারি কর্মচারীরা সামনের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটকর্মী হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক নন। তারা বিভিন্ন দপ্তরে যৌথভাবে গণস্বাক্ষর করে পিপি-২ ফর্ম জমা না দেওয়ার আবেদন করছেন। গত ৩ মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা দক্ষিণ চক্র অফিসে ১৫০ জন শিক্ষক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে পিপি-২ ফর্ম জমা থেকে বিরত থাকার আবেদন করা হলো। যদিও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কোনো আশ্বাস দেননি।

এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পাশের রাজ্য ত্রিপুরায় বলেছেন বছরে দুবার ডিএ দেবো আর পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চনা করছেন। দ্রব্যমূল্য যে হারে বেড়েছে দৈনন্দিন খরচাপাতিও বেড়েছে। তাই কর্মচারীদের ডিএ কেন্দ্রীয় সরকার বছরে দু'বার করে দিয়ে চলেছে। অন্যান্য রাজ্যও ডিএ দেওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ভারতবর্ষের একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যেখানে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মাত্র ৬ শতাংশ। আর বকেয়া রয়েছে ৩৬ শতাংশ। এই বকেয়া ডিএ আদায়ে একদিকে যেমন কোর্টে কেস চলছে, অন্যদিকে অনশন, ধরনা, আন্দোলন, ধর্মঘট চলছে। সবদিক থেকেই সরকারের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা চলছে। একটা সরকারের সমস্ত কাজকর্ম সফলভাবে পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মচারীদের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের সঙ্গে আর্থিক বঞ্চনা করে বেশিদিন পশ্চিমবঙ্গের মসনদে থাকা মুশকিল হবে। আন্দোলনের ঝড় উঠেছে গোটা রাজ্যে এই ঝড় থামাতে সরকার উদ্যোগ না নিলে সামনের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যোগ্য জবাব বাঙ্গলার মানুষ দিয়ে দেবেন।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

জি-২০-র সভাপতি হিসেবে ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধ। ভ্লাদিমির পুতিন ও ভোলোদিমির জেলেনস্কির সংঘাত এবার প্রভাব ফেলেছে জি-২০-তে। দিল্লিতে বসছে জি-২০ বিদেশ মন্ত্রীদের সম্মেলন। তার আগে আমেরিকা ও পশ্চিমি দেশগুলির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছে রাশিয়া। ইউক্রেন যুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে রাশিয়াকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে আমেরিকা ও তার সহযোগী দেশগুলি। সভাপতি দেশ হিসেবে ভারত কীভাবে সেই পরিস্থিতি সামাল দেয় এখন সেই দিকে তাকিয়ে কূটনৈতিক মহল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারসাম্য রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে এদিন ফের ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা। তিনি বলেন ইউক্রেন ইস্যুতে ভারতের অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। আমাদের মতে এটা যুদ্ধের যুগ নয়। আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে ইউক্রেন সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। কয়েক মাস আগে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে সাওয়াল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই আলোচনায় 'এটা যুদ্ধের যুগ নয়' প্রধানমন্ত্রীর সেই উক্তিই শোনা গিয়েছে বিদেশ সচিবের মুখে।

আলোচনা প্রেক্ষিতে বিশ্বে যুদ্ধ নয় শান্তি, এই মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর সরকারি ভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠিত হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জকে বিশ্বের বিবেক বলা হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ সার্বভৌম দেশসমূহের একটি সংগঠন। গ্রিক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল বলেছেন মানুষ মাত্রই রাজনৈতিক জীব।

বস্তুত মানুষের ধর্ম হলো সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করা। মানুষ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে মানুষ কতকগুলি নিয়ম-কানুন মেনে চলতে বাধ্য। এই নিয়ম-কানুনের বিশেষ উন্নত প্রকাশ হলো রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদি। সমাজজীবনের বিশ্লেষণের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের উৎপত্তি। বিশ্বে আজ এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণের দ্বারাই গঠিত বিশ্ব সমস্যা সমাধানের জীব শ্রেষ্ঠ মানব জাতির 'আত্মজ্যোতি' এই রাষ্ট্রসঙ্ঘ।

আবার সুইডেনের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেন। এই মারণাস্ত্র যুদ্ধবাজদের উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু তিনি সেটা চাননি। তাই তিনি মানবিক ভাবে পীড়িত হন। শান্তি ও সংহতি, আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময় ও সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি কল্পে মানব উন্নয়ন ও সৃষ্টিশীল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য সাহিত্য পুরস্কার 'নোবেল' উৎসর্গ করে যান। এই আলফ্রেড নোবেলের ব্যক্তিগত জীবন ছিল সুশৃঙ্খল। মানব জাতির এই সুমহান ব্যক্তি ধূমপান ও মদ্যপান বিরোধী ছিলেন। এই সুমহান ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে 'যুদ্ধ নয় শান্তি' আমাদের পাথেয় হোক।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
শিয়ালদহ, রাশিডাঙ্গা-২, কোচবিহার।

বিবাহবন্ধনের সৌন্দর্যকে নষ্ট করছে বিবাহবিচ্ছেদ

শুভশ্রী দাস

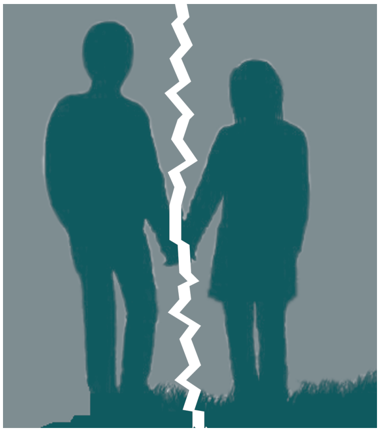

ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে বিবাহ জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন। পরিবারের দায়িত্বশীল অভিভাবকরা কুল, গোত্র, শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তরকম খোঁজখবর নেওয়ার পর, সহমতের ভিত্তিতে অগ্নি সাক্ষী রেখে স্ত্রী-পুরুষ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করে।

আমরা ভারতীয় চিন্তাধারার অনুসারী। এখানে সমস্ত সমস্যার সমাধান ভারতীয় পরম্পরার নিরিখেই করা হয়। কিন্তু কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে আমরা মৌলিক সিদ্ধান্ত থেকে সরে গিয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারার শরণাপন্ন হই। পৃথিবীর তাবৎ চিন্তাবিদের মতে, সমস্ত সমস্যার নিদান ভারতীয়ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে। দেশে এখন সবচেয়ে বড়ো আকারে দেখা যাচ্ছে পরিবার ভেঙে যাওয়া অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ।

ভারতে একসময় একান্নবর্তী পরিবারের প্রভাব ছিল। পরিবারের কোনো সমস্যা পরিবারের কর্তার হস্তক্ষেপেই সমাধান হতো। পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে কেউ গেলে তার কোনো সম্মানই থাকতো না। বর্তমানে একক পরিবার কল্পনাই বিবাহবিচ্ছেদ বাড়িয়ে দিচ্ছে। একক পরিবারে মান-অভিমান, সুখ-দুঃখের কেউ ভাগীদার থাকে না। একান্নবর্তী পরিবারে থাকলে বিবাহবিচ্ছেদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া স্ত্রী বা পুরুষ মানসিকভাবে হীনমন্যতায় ভোগেন। আপনজনদের মধ্যে তাঁরা খুব একটা সম্মান পান না। বিবাহের ফলে যে সামাজিক সম্মান পেয়েছিল, বিবাহবিচ্ছেদের ফলে সেই সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা আধুনিক শিক্ষার যতই দোহাই দিই না কেন বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া স্ত্রী বা পুরুষের সামাজিক মান্যতা কিছুই থাকে না।

আজকাল প্রায় দেখা যায়, কোনো কোনো মা-বাবা বিয়ের পরেও মেয়ের প্রতি খুব বেশি সহানুভূতি দেখান। ছোটো-খাটো কথাকেও বড়ো করে ফেলেন। কোনো কোনো বিষয়ে মা-বাবার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে মেয়ের পারিবারিক জীবন নষ্ট হয়ে যায়। মা-বাবার উচিত মেয়েকে এমন সংস্কার দেওয়া যাতে সে সুখে তার দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করতে পারে।

আমাদের দেশের একটা বড়ো বিড়ম্বনা যে, দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্যের চিন্তাধারাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। ইয়াংকি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের ধারণা বিবাহ কোনো সংস্কারই নয়, বরং স্ত্রী-পুরুষের প্রবৃত্তি পূরণের মাধ্যমমাত্র। কেউ কেউ এমনও আছে যারা মনে করে নারী শুধুমাত্র ভোগ্যবস্তু। লিভ-ইন-রিলেশনকে মান্যতা দেওয়া এই ভাবনাকে বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এর কুফলও বিবাহবিচ্ছেদ। সম্প্রতি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ফেসবুকে অত্যধিক আসক্ত দম্পতিদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ বেশি।

দেশে নিত্যনতুন আইন তৈরি হওয়ার ফলেও বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ছে। পিনাল-কোডের ৪৯৮-এ এবং ৩০৮-বি ধারা মহিলাদের ওপর অত্যাচার বিষয়ক আইন ছিলই। আবার ২০০৫ সালে 'পারিবারিক হিংসা নিরোধক আইন' তৈরি হওয়ার ফলে পরিবারের কোনো তুচ্ছ কারণে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে।

দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে গজিয়ে উঠছে এনজিও। যেগুলিতে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে বিবাহবিচ্ছিন্ন স্ত্রী বা পুরুষ কাজ করছে। এরা নিজেরাই সুখী দাম্পত্যজীবন নির্বাহ করতে পারেননি, তবু দেশের বিভিন্ন স্থানে সৎ পরামর্শের নামে পরিবার ভাঙার কাজেই উৎসাহ দিচ্ছে। তুচ্ছ কারণে মনোমালিন্যের জন্য এরা স্ত্রী-কে স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে। ফলস্বরূপ বিবাহবিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এর দুষ্প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই তাদের সন্তানের ওপর পড়ছে।

ভারত পুরুষতান্ত্রিক দেশ হলেও নারীকে এখানে ভোগ্যা মনে করা হয় না। তাদের লক্ষ্মী, পার্বতী, সীতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। সমস্ত মাঙ্গলিক কাজে স্ত্রী-র অগ্রাধিকার থাকে। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের সম্পর্ক অটুট রাখে সুষ্ঠুভাবে পরিবার চালানোর জন্য। কিন্তু পুরুষের বিরুদ্ধে এমন সব আইন তৈরি হয়েছে তাতে পুরুষরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতেই ভয় পাচ্ছে। দাম্পত্য জীবন সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করতে পারলেই বিচ্ছেদের সংখ্যা কমে যাবে।

হিন্দু চিন্তাভাবনাই পরিবারকে বেঁধে রাখতে পারে। আজ সমাজে হিন্দু বিবাহ সংস্কার এবং তার ভাবনা স্ত্রী-পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক করে তোলে। পাশ্চাত্য ভাবনার বৃদ্ধির জন্য এবং নিত্যনতুন তৈরি আইনের জন্য দিন দিন বিবাহবিচ্ছেদ বেড়েই চলেছে। এছাড়া, স্ত্রী-পুরুষ বিনা বিবাহে একসঙ্গে থাকাও এই কুপ্রথাকে উৎসাহিত করছে। অতিমাত্রায় অবাধ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী আমেরিকা ও চীনে বিবাহবিচ্ছেদ সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে কম ভারতে। শতাংশের হিসাবে ১.০১ হলেও ক্রমশ তা বৃদ্ধির দিকে।

এমতাবস্থায় দেশের যুবসমাজের মধ্যে ভাবনা জাগ্রত করতে হবে যে, বিবাহ শুধুমাত্র শারীরিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমমাত্র নয়, দেশ জাতির কল্যাণে আগামী প্রজন্ম আনার একটি পবিত্র সংস্কার। ◻

মা হওয়ার আগের ডাক্তারি পরীক্ষা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মা হওয়ার আগে সন্তানের সুস্থ জন্মদান সুনিশ্চিত করতে জরুরি কিছু পরীক্ষার। শুধু সন্তানই নয়, যে মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, সেই মায়ের সুস্থতাও নিশ্চিত করা জরুরি। নির্বিঘ্ন প্রেগন্যান্সি তবেই সম্ভব।

প্রাথমিক পরীক্ষা ও প্ল্যানিং : ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় একদম শুরুর দিকে কয়েকটি জরুরি পরীক্ষা প্রথমেই করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তার মধ্যে প্রধান হলো বিভিন্ন ধরনের রক্তপরীক্ষা। কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট পরীক্ষার মাধ্যমে ব্লাড সেল, প্লেটলেট কাউন্ট ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। গর্ভধারণ করার সময়ে মায়ের অ্যানিমিয়া হয়েছে কি না তা জানা জরুরি। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা, আয়রনের মাত্রা ইত্যাদি নিয়মিত পরীক্ষা করাতে হবে। এসজিপিটি-র মাত্রা কত, তাও খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়া মায়ের সুগার লেভেল, প্রেশার লেভেল নিয়মিত পরীক্ষা করানো দরকার। কারণ, অন্য সময়ে প্রেশার বা সুগার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও গর্ভাবস্থায় তা ওঠা-নামা করে অনেকেরই। অনেকের এ সময়ে থাইরক্সিন হরমোনের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। সুগারের মাত্রা বেড়ে জেস্টেশনাল ডায়াবিটিসের শিকারও হয়ে থাকেন অনেক মহিলাই। গ্লুকোজ চ্যালেঞ্জ টেস্ট করা হয়। চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ খেয়ে থাইরয়েড, সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

শুধু গর্ভধারণের পরেই নয়, এর প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করা দরকার সন্তান গর্ভে আসার আগে থেকেই। রুবেলা ভ্যাকসিন-সহ আরও বেশ কিছু সাবধানতা নেওয়া দরকার গর্ভধারণ করার আগে। এইচআইভি স্ক্রিনিং, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি সময় থাকতেই। গর্ভে সন্তান আসার পরেও তাকে সুস্থ ভাবে ধারণ করতে আপনার শরীর প্রস্তুত কিনা, তাও খতিয়ে দেখা দরকার। গাইনিকোলজিস্ট ডাঃ অভিনিবেশ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'অ্যান্টিনেটাল টেস্ট প্রেগন্যান্সির খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গর্ভাবস্থার পুরো সময়টা ধরে মা ও গর্ভস্থ শিশুর সুস্থতা বজায় রাখতে এই পরীক্ষাগুলি খুবই জরুরি। নানা ধরনের ইউরিন টেস্ট, ব্লাড টেস্ট, আল্ট্রাসাউন্ড টেস্টের মাধ্যমেই আমরা অনেক বিষয়ে আগে থেকে নিশ্চিত হতে পারি।'

সন্তানের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে : আপনার গর্ভে থাকা ভ্রূণ যখন একটু একটু করে বেড়ে উঠছে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ কিনা বা তার কোনও জটিলতা তৈরি হচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। চিকিৎসকরা এ জন্য একাধিক আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্রিনিঙের সাহায্য নিয়ে থাকেন। শিশুর ক্রোমোজোমাল ডিফেক্ট বা ডাউন সিনড্রোমের সম্ভাবনা আছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হয় ডাবল মার্কার টেস্টের মাধ্যমে। গর্ভাবস্থা আরও পরিণতির দিকে এগোলে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে ফেটাল ইকোকার্ডিয়োগ্রাফি করে দেখা হয় শিশুর হৃদ্‌যন্ত্র ঠিক মতো কাজ করছে কিনা। এটিও এক ধরনের আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা। প্রতি ট্রাইমেস্টারেই একাধিক ইউএসজি করে গর্ভস্থ শিশুর বেড়ে ওঠা পর্যবেক্ষণ করা হয়। গর্ভাবস্থা পাঁচ মাস পেরোলে (২০ সপ্তাহের পরে) একটি ডিটেলড অ্যানোমালি স্ক্যান করা হয়। এতে বেড়ে ওঠা ভ্রূণের আয়তন, ওজন, মস্তিষ্কের বৃদ্ধি, স্পাইনাল কর্ড এবং অন্যান্য হাড়ের গঠন, হৃদ্‌স্পন্দন-সহ আরও বেশ কিছু অ্যানাটমিক্যাল বৈশিষ্ট্য বিশদে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। কোনো জটিলতা তৈরি হলে সেটিও এই আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানে ধরা পড়ে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। শুধু শিশুই নয়, মায়ের পেলভিক এরিয়া, প্লাসেন্টা, অ্যামনিয়োটিক ফ্লুয়িড ইত্যাদির বিশদ চিত্রও দেখা সম্ভব এই পরীক্ষায়। এই অ্যানোমালি স্ক্যানটি তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ভ্যাকসিনেশন ও সুরক্ষা : প্রেগন্যান্সি প্ল্যানিঙের আগে এবং গর্ভাবস্থা চলাকালীন একাধিক ভ্যাকসিন নেওয়া যেতে পারে। ফ্লু ও টিটেনাসের মতো পরিচিত ভ্যাকসিন তো বটেই, ডিপথেরিয়া, চিকেন পক্স, হুপিং কাশির মতো অসুখের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে আরও কিছু ভ্যাকসিন নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে অবশ্যই নিজের চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে সেইসব ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত, নির্দিষ্ট সময়ে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে : গর্ভাবস্থা যখন প্রায় পরিণত, পরিপূর্ণ আকার ধারণ করে, সেই তৃতীয় ট্রাইমেস্টারের আল্ট্রাসাউন্ডের ব্যবধান কমে আসে। সপ্তাহ দু-তিনেক অন্তরই ডাক্তাররা চেক করে দেখেন শিশুর গ্রোথ এবং রক্ত সঞ্চালন কী রকম ও সেই অনুযায়ী ডেলিভারির প্ল্যানিং করে থাকেন (সি-সেকশনের ক্ষেত্রে)। তাই এই সময়ের ডপলার আল্ট্রাসাউন্ডগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সন্তান আসার খবর পাওয়া মাত্রই নানা সাবধানতা, বিধিনিষেধ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয় মায়েদের। তবে এ সবই করা হয় ঝুঁকির সম্ভাবনা এড়াতে। নিয়ম মেনেও যথাসম্ভব স্বাভাবিক হাসিখুশি জীবনযাপন এবং নিজেকে সচল রাখাও জরুরি এ সময়ে। তবেই মসৃণ হবে মাতৃত্বের যাত্রাপথ। □

মুক্তির মন্দির সোপানতলে

ড. জিষ্ণু বসু

ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্তি দেবার জন্য কত বীর সন্তান নিজের তাজা রক্ত দিয়েছে। আজ মুক্তির মন্দিরে তাদের বলিদানের বেদনাবিধুর শিলালিপি। ইউরোপ থেকে আসা ঔপনিবেশিক শাসনের চিহ্ন অক্টোলনি মুনমেন্ট, তাদের রাজার নামের দুর্গ 'ফোর্ট উইলিয়ম'। স্বাধীনতার এত বছর পরেও ফোর্ট উইলিয়ামের নাম 'ফোর্ট রাসবিহারী' বা 'ফোর্ট সুভাষ' হলো না।

আরব সাম্রাজ্যবাদী বা তুর্কি আক্রমণকারীরা ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতিকে থেঁতলে দিয়েছিল। এদেশের পূজার বেদীকে রক্তরঞ্জিত করেছে, মাতৃজাতির সম্মান ধুলায় মিশিয়েছে। এই পর্যায়ে সবথেকে বড়ো আঘাত লেগেছিল হিন্দু জনমানসের সবচেয়ে বড়ো শ্রদ্ধাস্থল অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির, মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি মন্দির আর কাশীতে ভগবান বিশ্বানাথ মন্দির ধ্বংসের বেদনা। ষোড়শ শতাব্দী থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু তাদের আরাধ্য দেবতার মন্দির দেখতে এসে চোখের জল ফেলে ফিরে যেতেন। হাজার হাজার হিন্দু এই জন্মভূমি মন্দির উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিয়েছেন শতশত বছর ধরে। এই শতশত বছরের পুঞ্জীভূত দুঃখ-লাঞ্ছনা মোচনের জন্য সেদিন হিন্দুসমাজ কটিবদ্ধ হয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে। সারা দেশ থেকে বুকের বেদনা, রামলালার প্রতি অপার ভক্তি আর প্রতিজ্ঞা নিয়ে অযোধ্যায় এসেছে শ্রীরাম শিলা। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও সেদিন ঔপনিবেশিক শাসনের, অত্যাচারের চিহ্নকে রক্ষা করতে সক্রিয় ছিল প্রশাসন। করবেসকদের মনের অবস্থা সুন্দরকাণ্ডে বর্ণিত শ্রীরামসেনার মতো।

কবি কৃত্তিবাস ওঝার শ্রীরাম পাঁচলীর সুন্দরকাণ্ডের বর্ণনায়,

'পিতা-পুত্রে পক্ষীরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক-সহ দক্ষিণ সাগর।।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর তরঙ্গ দেখি গণিল প্রমাদ।।
তমোময় দেখা যায় গগন-মণ্ডল।
হিল্লোলে কল্লোল উঠে সমুদ্রের জল।।
সিন্ধুজলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে।।

ঠিক তেমনই মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহ যাদবের প্রশাসন করসেবকদের দমন করার সর্বপ্রকার প্রয়াস করেছিল। অযোধ্যাগামী সব রাস্তায় আগ্নেয়াস্ত্রধারী পুলিশ, খাদ্যের জোগান বন্ধ করা, সব কটি নগরপালিকাতে জল বন্ধ করে দেওয়া— এই সবের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের মন্দির ধ্বংস করে বিদেশি আক্রমণকারী বাবরের তৈরি

বিতর্কিত সৌধ রক্ষা করার জন্য ছিল বজ্র আঁটুনি।

কলকাতা থেকে পৌঁছেছিলেন একদল তরতাজা যুবক। ২৪ অক্টোবর, ১৯৯০ সাল। প্রথম দিকে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন প্রদীপ গুপ্তা। কিন্তু কাশীতে নেমে অযোধ্যার পথে ফুলপুরে গ্রেপ্তার হয়ে যান প্রদীপ গুপ্তা। রাম কোঠারী, শরদ কোঠারী, রাজেশ আগরওয়াল, চন্দ্রশেখর আগরওয়াল, কমল শা, লালন তেওয়ারি, রামজীবন পাণ্ডে, সর্বেশ রায়, নারায়ণ সোনী, গঙ্গাসাগর প্রজাপতি ফুলপুর থেকে অযোধ্যার দিকে এগোতে থাকেন। কাশী থেকে অযোধ্যা ৭৩১ আর ৩৩০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে গেল ২০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি রাস্তা। কিন্তু রাস্তা তো বন্ধ। তাই গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

২৪ অক্টোবর সকালেই ফুলপুর থেকে যাত্রা শুরু হলো। করসেবকদের জন্য গ্রামের রামভক্তদের আপ্যায়ন ছিল দেখার মতো। এ যেন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। পুরো গ্রাম যেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সেবা করার জন্য সবকিছু নিয়ে প্রস্তুত। দরিদ্রতম গ্রামবাসীরও যোগদান ছিল দেখার মতে। ৬ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম আর বুদ্ধিমত্তার ফলে করসেবকদের একটি বড়ো দল ৩০ তারিখে রামজন্মভূমিতে উপস্থিত হলেন। প্রশাসনের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে বিতর্কিত সৌধের মধ্যে প্রবেশ করা ছিল অর্ধেক যুদ্ধ জয়। ৩০ অক্টোবর, ১৯৯০ সেই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল। বহু শতাব্দী পরে রাম জন্মস্থান মন্দির পরিসরের চূড়ায় দেখা গেল সুবর্ণ গৈরিক ধ্বজা।

এই পরাজয়ের পর থেকে প্রশাসন যেন পাগল হিংস্র শ্বাপদের মতো আচরণ শুরু করে। করসেবকদের উপর অত্যাচরের মাত্রাও বাড়তে থাকে। অথচ করসেবকদের আচরণ ছিল শান্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। সকালে সরযূ নদীতে স্নান করে ফেরার সময় রাজেশ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা হলো দুই ভাইয়ের। রাম আর শরদ দুজনই একটা সেলাইয়ের দোকানে সামনে দাঁড়িয়ে কিছু করছে। আগ্রহী হয়ে রাজেশ গেলেন

দোকানের সামনে। দুইভাই দরজিকে দিয়ে মাথায় বাঁধার জন্য গৈরিক ফেট্টি সেলাই করাচ্ছে। রাজেশকে দেখে রাম কোঠারী বলে উঠলো, 'ভাই, কপালে কফন বেঁধে নিলাম, রামলালার জন্মভূমিকে মুক্ত না করে অযোধ্যা থেকে ফিরবো না। আজ কিছু একটা হবেই।' বলতে বলতে রামের চোখ ছলছল করে উঠলো।

সেদিন দুপুরেই লালচকের রাস্তায় রামধূন গাইবার সময় করসেবকদের উপর কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো হলো। করসেবকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলিতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য সমবেত হন। রাম আর শরদ কোঠারীও একটি বড়িতে আশ্রয় নেন। বাইরে খেপা ষাঁড়ের মতো আস্ফালন করে ছুটে বেড়াচ্ছে পুলিশ আর আধা সামরিক বাহিনী। মাঝে মধ্যেই দরজায় লাথি মেরে যাচ্ছে তারা। দরজায় আগল দিয়ে তাকে রক্ষা করার জন্য দরজার ঠেস দিয়ে একদল তরতজা যুবক ছেলের দল দাঁড়িয়ে ছিল। ছিল শরদ কোঠারী। হঠাৎ প্রশাসন ছলনার আশ্রয় নিল। দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এল, 'পানি দিজিয়ে, ভাইয়া পানি। বহোত কষ্ট হো রাহা হ্যায়!'

বাইরের থেকে কোনো তৃষ্ণার্ত করসেবক ভেতরে আসতে চইছেন, এমনটা ভেবেই দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল বাহিনী। হিংস্র জিঘাংসায় ঝাঁপিয়ে পড়লো করসেবকদের উপর। শরদের মতো তিন-চারজনকে টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে মরতে থাকে তাদের। ভাইকে টেনে বাইরে নিয়ে গেছে শুনে রামও জোর করে বাইরে বের হয়ে আসে। রাম কোঠারী এসে প্রতিবাদ করতেই তার উপর গুলি চালানো হয়। শরদ দাদার শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেমি অটোমোটিক রাইফেলের গুলিতে দুজনের শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। ওই বাড়িতেই কর্নেল অরোরার মতো করসেবকরাও ছিলেন। গুলি চলছে দেখে তাঁরাও বের হয়ে আসেন। শতাধিক করসেবকের দল ঘিরে ধরে। বেগতিক দেখে বলিদানকারী করসেবকদের মরদহ ফেলে পুলিশবাহিনী পালিয়ে যায়।

তখন দুপুর। প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে আছে বীর হুতাত্মার দেহ। রাম-শরদের জ্যাঠতুতো ভাই নন্দলাল কোঠারীও করসেবায় গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে যাওয়া কোঠারীভাইদের মরদেহ মণিরাম ছাউনিতে নিয়ে আসা হলো। কারণ বহু করসেবকের মৃতদেহ প্রশাসন উঠিয়ে নিয়ে সংস্কার না করে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

করসেবকদের তৎপরততেই পুলিশ এসে ঠিকঠাক কাগজ তৈরি করে ২ কিলোমিটার দূরে রিকাবগঞ্জ হাসপাতালে পাঠায়। কেস শুরু করে মরদেহের পোস্টমর্টেম করা হলো। ২ তারিখে কলকাতা থেকে এলেন রাম-শরদের জ্যাঠামশাই দাউলাল কোঠারী, সঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিবনারায়ণ মুন্দ্রা। সরযূ ঘাটে এই দুই বীর ভাইয়ের দাহ সংস্কার করা হলো। ভাই নন্দলাল কোঠারী মুখাগ্নি করলেন।

ভারতের মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমিতে আজ এক অপরূপ মন্দির তৈরি হচ্ছে। বিদেশি অত্যাচারী আক্রমণকারীর কলঙ্কচিহ্ন বাবরি সৌধ আজ আর নেই। দেশমাতৃকার বিজয়ধ্বজ আজ অযোধ্যার নির্মীয়মাণ আন্তর্জাতিক মন্দিরশহরে সর্বত্র উড়ছে। এই কলঙ্কমোচনে রাম কোঠারী আর শরদ কোঠারীর বলিদান কালের কপালে চিহ্নের মতো অঙ্কিত হয়ে থাকবে। ■

ফিরে দেখা

বাংলার বলিদানী পরম্পরার উজ্জ্বল উদাহরণ রাম কোঠারী ও শরদ কোঠারী ঃ অশোক সিংঘল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। স্বাধীন ভারতে রামচন্দ্রের জন্মস্থানে মন্দির নির্মাণ করতে যাওয়া করসেবকদের গুলি করে হত্যা করার ঘটনা পড়ে ভবিষ্যতের ইতিহাস গবেষকরা স্তম্ভিত হয়ে যাবেন বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অশোক সিংঘল। তাঁর প্রশ্ন, আজকে যদি রামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মিত না হয়, তবে কোথায় হবে? প্রশ্ন শ্রীসিংঘলের মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতে উপস্থিত সমবেত জনতা দু'হাত তুলে বলে ওঠেন, 'রামের নামে প্রতিজ্ঞা করে বলছি মন্দির আমরা ওখানেই বানাব।'

গত ২৭ নভেম্বর কলকাতায় ডিডো মাহেশ্বরী বিদ্যালয়ে রামকুমার ও শরদকুমার কোঠারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানেই শ্রীসিংঘল ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রসঙ্গত, কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয় অযোধ্যায় করসেবা করতে গিয়ে ২ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রীসিংঘল বলেন,কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয় বাংলার বলিদানী পরম্পরাকে আরও উজ্জ্বলতর করেছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা, বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ঝুনঝুনওয়ালা, কেন্দ্রীয় অছি সদস্য ডাঃ সুজিত ধর, রামকার্য সেবা সমিতির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক প্রীতিমাধব রায় প্রমুখ। কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতাকে মাল্যভূষিত করার সময় উপস্থিত সমস্ত মানুষ নিজ নিজ আসন থেকে ঠ দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন।

অশোক সিংঘল তাঁর ভাষণে রামমন্দির নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলার কথা ঘোষণা করে বলেন, রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার না হয়ে মুসলমানদের উচিত অবিলম্বে নিজেদেরই ইসলামি স্থাপত্যটিকে ৫০০ গজ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কারণ, সিংঘলের মতে সরকার কিংবা রাজনৈতিক নেতারা নন, মুসলমানদের নিরাপত্তার একমাত্র গ্যারান্টি হলেন হিন্দুরা। হিন্দুদের এই ধর্মীয় ভাবাবেগকে সম্মান জানানোর বদলে আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলমানদের নিরাপদে ও সুখে-শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন অশোক সিংঘল।

মুসলমান অধ্যুষিত কোনো কোনো অঞ্চলকে 'স্পর্শকাতর' বলে চিহ্নিত করার বিরোধিতা করে শ্রীসিংঘল বলেন, একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে 'স্পর্শকাতর অঞ্চল' বলে বিশেষভাবে কিছু চিহ্নিত হতে পারে না। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন, এই অজুহাতে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়ে হিন্দুদের শোভাযাত্র বা মিছিল যাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করা হলে তার পরিণতি ভালো হবে না। তাঁর কথাকে উপস্থিত জনতা সমস্বরে সমর্থন করেন।

পরিষদের পরবর্তী কর্মসূচির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে শ্রীসিংঘল বলেন, আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে দ্বিতীয় দফার করসেবা সত্যাগ্রহ শুরু করা ছাড়াও সারা দেশে নিহত করসেবকদের অস্থিভস্ম নিয়ে অস্থিকলস যাত্রা হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ যাতে জানতে পারেন কীভাবে এবং কী কারণে রামভক্তরা সরকারি নিধনের শিকার হয়েছেন। এই যাত্রার মূল লক্ষ্য হবে এটাই।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী করসেবায় বিজেপির ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন, রামমন্দির নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছে ধর্মীয়-সামাজিক সংস্থা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। কিন্তু বিজেপি তার পাহারাদার। তিনি ঘোষণা করেন, মন্দির নিয়ে কোনো আপোশ করা হবে না। এবং তা নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এরপর বীরমাতা সুমিত্রাদেবীর হাতে একটি স্মৃতিফলক তুলে দেওয়া হয়। তারপর কয়েকজন করসেবক নিজেদের অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে ডাঃ সুজিত ধর বলেন, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের কাজ সবে শুরু হয়েছে। এখনও অনেক পথ বাকি। কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, এরাজ্যের সবাই বামপন্থী নন, এখানে যে অসংখ্য রামপন্থীও আছেন, রাম ও শরদ কোঠারীরাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। একথায় পুরো সভা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, করসেবকদের ওপর যারা অত্যাচার চালিয়েছে তাদের কাউকেই ছেড়ে কথা বলা হবে না। আইনের আওতা থেকে এমনকী স্বয়ং মুলায়ম সিংও রেহাই পাবেন না। সরাকরি দমনপীড়নের বহু তথ্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হাতে এসেছে, তার ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে পরিষদ।

সভাপতি শ্রীভুয়ালকার বলেন, রামমন্দির নির্মাণে বাধা দিয়ে কোনো সরকারই ক্ষমতাই টিকে থাকতে পারবে না। কারণ, সমগ্র হিন্দু সমাজই এখন এই আন্দোলনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

(১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, স্বস্তিকায় প্রকাশিত। স্বস্তিকার আর্কাইভ থেকে)

ফিরে দেখা

রামজন্মভূমি মন্দিরের চূড়ায় বাংলার কোঠারী ভাইয়েরাই প্রথম গেরুয়া পতাকা উড়িয়েছিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা।। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের উপরই যে গড়ে তোলা হয়েছে বিতর্কিত বাবরি মসজিদ, তরুণ করসেবকদের মনে তাই নিয়ে ক্ষোভ ছিল। এটা নানাভাবে প্রকাশও পেয়েছে। বিপুল জনসমাগমের প্রতিচ্ছায়ায় উদ্ভাসিত তাদের চিন্তা — এ হলো পবিত্র শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির।

অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের চূড়ায় যে গেরুয়া নিশান উড়ানো হয়ে গিয়েছে, এখবর ৩০ অক্টোবরের বিকেলের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সেদিনের সান্ধ্য কাগজগুলিতেও লেখা হয়েছিল, 'পশ্চিমবঙ্গের বজরঙ্গ দলই ছিল সেদিন পুরোভাগে।' আর এই দলে কোঠারী ভাইয়েরাও ছিল। তারাই সেদিন অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের চূড়ায় গেরুয়া পতাকা উড়িয়েছিল। বিজয়ের গর্বে অনুপ্রাণিত দু'ভাই দ্বিতীয়দিনের করসেবার সংগ্রামেও সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। অযোধ্যায় করসেবা করতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসবেন না এমন বলিদানীর সংখ্যা একশোরও বেশি বলে জানা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে কয়েক হাজার করসেবক অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। এক-এক করে তাঁদের সবাই ফিরেছেন। বাকি শুধু দুজন। দু'ভাই। দুই কোঠারী ভাই। তাঁরা আর ফিরবেন না। যেমন একদিন ফেরেনি চাপেকার ভাইয়েরা। ২ নভেম্বর বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ ফৈজাবাদ থেকে কলকাতায় টেলিফোনে এই মর্মান্তিক খবরটি আসে। এবং সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে এক গভীর শোকের ছায়া। কম-বেশি সবাই বিচলিত হয়ে পড়েন।

২২ অক্টোবর রাতের কথাটাই সকলের আগে মনে পড়ে। গুণে গুণে ঠিক এগারো দিন আগের কথা। হাওড়া স্টেশনে করসেবকরা জড়ো হয়েছেন। কালকা মেলে রওনা হবেন। প্রদীপ গুপ্তার নেতৃত্বে বড়বাজার এলাকার করসেবকদের বাহিনীতে সংখ্যা হবে প্রায় একশো। বেশিরভাগই তরুণ। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। শ্রীরামমন্দির নির্মাণে আত্মনিবেদনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কপালে তিলক। বুকে বজরঙ্গ দলের ব্যাজ। কণ্ঠে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। পুরো প্লাটফর্মের চেহারাটাই পালটে গিয়েছিল সেদিন।

করসেবকদের অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন তাঁদের আত্মীয়-বন্ধু, ভাই-বোন, মা-বাবা। এসেছিলেন হীরালাল কোঠারীও। হীরালালবাবু মাহেশ্বরী সংগীত বিদ্যালয়ের শিক্ষক। শেয়ার মার্কেটে ব্যবসাও আছে। দুই ছেলেও তাঁর কাজে সাহায্য করে। তাঁর সেই দুই ছেলে রামকুমার ও শরদকুমার অযোধ্যায় করসেবা করতে যাচ্ছে। বড়ো আনন্দের দিন। ওদের মাকে নিয়েই তাই তিনি সেদিন হাওড়া স্টেশনে এসেছিলেন। কিন্তু তখন কী আর জানতেন যে ছেলেদের সঙ্গে তাঁদের সেই শেষ দেখা।

দু'ভাইয়ের পুরো নাম রামকুমার কোঠারী আর শরদকুমার কোঠারী। দুই ভাই , এক বোন। রামকুমারের বয়স বাইশ আর শরদকুমারের বিশ। কলকাতার উমেশ চন্দ্র কলেজ থেকে রামকুমার পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছিলেন। আর শরদ ছিল ওই কলেজেরই বি কম প্রথম বর্ষের ছাত্র।

দুজনেই ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। রামকুমার জোড়াবাগান পার্কের মহেশ সায়ম্ শাখার কার্যবাহ। শরদ তারাসুন্দরী পার্কের বিক্রম সায়ম্ শাখার মুখ্যশিক্ষক। রামকুমার সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ আর শরদ দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক। আগে তারা থাকতেন কলকাতার বি কে পাল এভিনিউতে। এখন তাঁরা থাকেন হাওড়ার বালি ঘোষপাড়ায়।

ঘোষপাড়ার বাড়িতে কীভাবে খবর দেওয়া হবে তা নিয়ে কেউ পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ৪২ নং কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটের একটি ঘরে সবাই তখন রুদ্ধবাক। এমন সময় হীরালালবাবু এলেন। যেমনভাবেই হোক তিনি একটু আঁচ পেয়েছিলেন। তিনি ঢুকতেই ঘরের পরিবেশ যেন আরও ভারী হয়ে উঠল।

সোজাসুজিই জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? ঘায়েল?

উত্তর কে দেবে। সবারই তখন শ্রবণকুমারের পিতার সামনে দশরথের অবস্থা।

তবে কী?

পুরো ঘরটা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। দুজনের কথা আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয়নি।

'কেঁদে কী হবে? শ্রীরামের কাজেই তো লেগেছে।' হা ঈশ্বর! শ্রবণকুমারের পিতা তবু অভিশাপ দিয়ে মন হালকা করেছিলেন। আর হীরালালবাবু অভিশাপ নয়, সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এমন মানুষের সামনে মাথা নত না করে পারা যায়?

এসপ্ল্যানেড ইস্টের সংহতি সভায় অযোধ্যার বীর বলিদানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাদেশিক সঙ্ঘচালক কালিদাস বসু সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিলেন।

সংযোজন।। ৫ নভেম্বর বিকেলে যখন কোঠারীদের বাড়ি পৌঁছালাম, তখন সেখানে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীকেও দেখলাম। অন্য আরও কয়েকজনের সঙ্গে তিনিও সদ্য সন্তানহারা এই পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বালি ঘোষপাড়া ঠিকানা হলেও কোঠারীদের বাড়ি বেলুড় দিয়ে যাওয়াই সুবিধেজনক। বেলুড় স্টেশন থেকে পনেরো-বিশ মিনিটের হাঁটা পথ। বাড়ির দোতলায় কোঠারীরা থাকেন। ঘরের একপাশে একটি চৌকিতে বসেছিলেন বদ্রীদাস কোঠারী। অশীতিপর বৃদ্ধ। পাশে মেঝেতে বসে পুত্র হীরালাল কোঠারী। সেই মর্মান্তিক খবর শুনেও তিনি কারখানার শ্রমিকদের মাইনে দিয়ে তবে বাড়ি ফিরেছেন।

ঘর ভর্তি লোক। সিঁড়িতে জুতোর ডাঁই। বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই। নীরবে সবাই বসে আছেন। শুধু পাশের ঘর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ডুকরে কেঁদে ওঠার শব্দ। কে সান্ত্বনা দেবে! শুনলাম, বড়বাজার কুমারসভা তাঁকে 'বীরমাতা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করবে। অহিংসা প্রচার সমিতির মুখপাত্র যখন প্রস্তাব করলেন, তাঁরাও তাঁদের সম্মানে একটি সভা করতে ইচ্ছুক, তখন হীরালালবাবু নম্রভাবেই তা অস্বীকার করলেন। বললেন,' সব সম্মানের অধিকারী ওদের মা। তাঁরই দুঃখ।'

সেদিন শেয়ার মার্কেটের কাজকর্ম বন্ধ হয়েছিল। প্রয়াত ভ্রাতৃদ্বয়ের স্মরণে গৃহীত হয়েছিল একটি প্রস্তাব। তারই একটি ফোটোকপি হীরালালবাবুকে দেওয়া হলো। এরই মধ্যে একজন সেদিনের কাগজখানার অংশবিশেষ পড়ে শোনালেন। এই রিপোর্টের সঙ্গে আগে শোনা প্রত্যক্ষদর্শী শম্ভুনাথ ধাড়ার বক্তব্যে প্রায় পুরোপুরি মিল। শ্রীধাড়া বলেছিলেন, ৩০ অক্টোবর যাঁরা বিতর্কিত স্থানে গম্বুজের উপরে গৈরিক পতাকা লাগিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়। গত ২ নভেম্বর করসেবা করার জন্য এগিয়ে গেলে রাম ও শরদ কোঠারীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হলেও তাঁদের ঘর থেকে টেনে বের করে এনে গুলি করা হয়। যারা গুলি করে, তাদের মুলায়ম সিং যাদবের কাছের লোক বলে মনে করা হচ্ছে।

খবরটা শুনেই বৃদ্ধ ঠাকুর্দা বদ্রীদাসজী কেঁদে উঠলেন। পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ধরা গলায় বললেন, 'ওরা ইচ্ছে করে মেরেছে। মুলায়ম সিং হত্যাকারী।' কেউ কেউ বদ্রীনাথজীর কথাকে সমর্থন করে বললেন মুলায়মের বিরুদ্ধে 'কেস' করা হবে।

তাওজী দাউদয়াল কোঠারীর সেদিনই চিতাভস্ম নিয়ে কলকাতায় পৌঁছানোর কথা অযোধ্যায় সরযূতীরে হাজার হাজার করসেবকের 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির মধ্য দিয়ে দুই ভাইয়ের অন্তিম সংস্কারের কথাও বৃদ্ধ বদ্রীদাস শুনলেন।

ইতিমধ্যে কলকাতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয় থেকে একটি শোকমিছিল বেরোয়। গঙ্গায় জগন্নাথ ঘাটে অযোধ্যায় নিহত বীর বলিদানীদের উদ্দেশে স্মৃতিতর্পণ করা হয়। হীরালালবাবু বললেন, গত বছর রামশিলাপূজার সময় থেকেই দু'ভাই একাজে লেগে পড়েছিল। যত দিন গেছে ততই তাদের রোখ বেড়েছে— 'কেন ওরা মন্দির করতে দেবে না ? যদি না দেয় তবে আমরাই করব।'

২২ অক্টোবর ওরা রওনা দেয়। প্রথমে বেনারসে নামে। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে যায় আজমগড়ে। তারপর ২০০ কিমি হেঁটে অযোধ্যায় পৌঁছায়। মাঝে মধ্যেই টেলিফোন করে ওরা বাড়িতে এসব জানিয়েছে।

এই রোখই সেদিন তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছিল। আত্মনিবেদনে অটল। আর এজন্যই কলকাতায় বিজেপি কাউন্সিলর শান্তিলাল জৈনের কাছে ৯০০ টাকা দিয়ে বলেছিল, ' শান্তিলালজী, এটা রাখুন। আর আমরা ফিরে আসবো কিনা জানি না।'

হীরালালবাবু জানালেন, সব কাজই তৎপরতার সঙ্গে হয়েছে। বাবা রামদাসজীর আশ্রমে সারা রাত দু'ভাইয়ে শব রাখা হয়েছিল।' তারপর একটু চোখ মুছে বললেন,'মন্দির জরুর বনে, হিন্দুরাষ্ট্র কা স্থাপনা হো। –এহি প্রার্থনা।'

(১২ নভেম্বর ১৯৯০, স্বস্তিকায় প্রকাশিত।
সৌজন্যে ঃ স্বস্তিকা আর্কাইভ)

কোঠারী ভাইদের আত্মত্যাগ ভুলে গেলে চলবে না : পূর্ণিমা কোঠারী

কলকাতা থেকে অযোধ্যার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন দুই তরুণ করসেবক। সঙ্ঘের একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক রাম কোঠারী ও শরদ কোঠারী। ৩০ অক্টোবর, ১৯৯০। সেদিন কার্তিক পূর্ণিমা। ঘুরপথে অযোধ্যায় প্রবেশ করে গম্বুজের ওপরে গৈরিক পতাকা উত্তোলন করেন। ২ নভেম্বর হনুমানগড়ি মন্দিরের সামনে ভজন গাইছিলেন তাঁরা। কিছু পরেই পুলিশ শুরু করে এলোপাথারি গুলি। বীরগতি প্রাপ্ত হন রাম ও শরদ। ৩২ বছর পর বড়বাজারের খেলাত ঘোষ লেনের বাড়িতে বসে স্বস্তিকার প্রতিনিধি নিখিল চিত্রকরের সামনে চোখের জলে সেদিনের স্মৃতি রোমন্থন করলেন রাম-শরদ কোঠারীর বোন পূর্ণিমা কোঠারি।

স্বস্তিকা : সেদিনের দুর্ঘটনার খবর আপনাদের কাছে কীভাবে এসে পৌঁছলো?

পূর্ণিমা : আমরা তখন বেলুড়ে থাকি। সেই সময় তো মোবাইল ফোনের যোগাযোগ ছিল না। একমাত্র বিএসএনএলের ল্যান্ডফোনই ভরসা। কিন্তু আমাদের বাড়িতে তখনও ফোনের সংযোগ আসেনি। এমনকী পুরো বিল্ডিঙে কারও ফোন ছিল না। টিভি বলতে দূরদর্শন চ্যানেল। মা, আমি ও বাড়ির অন্যান্য সবাই টিভির সামনে বসেছিলাম। দূরদর্শনের খবরে বলছিল সবকিছুই ঠিক আছে। পুলিশ ভালোভাবে সবদিক সামলে রেখেছে। শান্তিপূর্ণভাবে করসেবা চলছে। তবে এই খবর শুনেও মা শান্তি পাচ্ছিল না। মায়ের মন সকাল থেকেই ভারাক্রান্ত। আমরা বলছিলাম, সবকিছু ঠিক আছে। দাদারাও ভালো আছে। কিন্তু মা মানতে চাইছিলেন না।

স্বস্তিকা : আপনার তখন কত বয়স?

পূর্ণিমা : আমি তখন ১৯ বছরে পড়েছি। পরের মাসে ১৩ ডিসেম্বর আমার বিয়ে ছিল। মুলায়ম সিং যাদবের পুলিশের গুলিতে যে করসেবকরা নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কোঠারী ভাইয়েরাও আছে, এখবর কলকাতায় পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই পুরো বড়বাজার বনধ্ হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে আমার বিয়ের তোড়জোড়ের ব্যাপারে বাবা সেদিন বড়বাজারেই ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সবাই বাবাকে চিনতেন। বিকেল ৪ টের দিকে তাঁরাই বাবাকে খবরটা দেন। কিন্তু বেলুড়ে এসে মায়ের কাছে সেই দুঃসংবাদ দেওয়ার মতো মনের অবস্থা কারও ছিল না। অথচ রাত ৮ টা পর্যন্ত দূরদর্শনে কোথাও কোনও গুলি চালনা, হতাহতের খবর দেখাচ্ছিল না। সেই রাতে বাড়িতে আত্মীয়দের আনাগোনা চলছিল। আমাদের বলা হলো দাদাদের মধ্যে কেউ একজন গুলি লেগে আহত হয়েছে। আমি অযোধ্যা যাওয়ার জেদ করলাম। বললাম, দাদাদের সেবা করার জন্য আমি যেতে চাই অযোধ্যায়। আমাকে এখনই পাঠাবার ব্যবস্থা করো। বাবা বললেন, হ্যাঁ, আমরা সবাই যাবো। একটু ধৈর্য রাখো। পরের দিন সকালে আমাদের এক নিকটাত্মীয় এসে সত্যিটা বললেন। তার পর যা হয়....

স্বস্তিকা : সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে বামেদের সরকার। এই ঘটনার পর সরকারের কী প্রতিক্রিয়া ছিল?

পূর্ণিমা : এখানকার সরকার তখন একটু ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। তারা ভয় পাচ্ছিল রাম-শরদের মরদেহ এখানে আনা হলে হিন্দুদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে পারে। অনভিপ্রেত কিছু ঘটতে পারে। ওরা চাইছিল না দাদাদের মরদেহ এখানে আনা হোক। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফে সরাসরি আমাদের তেমন কিছু বলা হয়নি। তবে আমার দাদাজী (বদ্রীদাসজী কোঠারী) চেয়েছিলেন, রামজন্মভূমির মতো পবিত্র ভূমিতে তাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছেন, সেখানেই তাঁদের দাহকার্য সম্পন্ন হোক। সেই মতো সবকিছু অযোধ্যাতেই করা হয়েছিল।

স্বস্তিকা : প্রভু শ্রীরামের জন্য আরেক রাম ও তাঁর ভাই শরদ আত্মবলিদান দিয়েছেন। নিজের দুই দাদাকে হারানোর দুঃখ না রামমন্দির আন্দোলনের জন্য দুই মহান সৈনিকের আত্মত্যাগ, আপনার কাছে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

পূর্ণিমা : ঘটনার দু'তিনদিন পরের কথা। তখন বাড়িতে প্রায়ই সাংবাদিকরা আসতেন। একজন বাবাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার

দুই পুত্র রামমন্দিরের জন্য প্রাণ বলিদান করলেন। আপনার যদি আরও দুই পুত্র থাকত, আপনি কী করতেন। বাবা বলেছিলেন, আমি তাদেরও প্রভু শ্রীরামের চরণে করসেবায় পাঠাতাম। একথা ঠিক যে দাদাদের হারানোর দুঃখ আমাদের পরিবার আজও ভুলতে পারেনি। কিন্তু তার থেকেও বেশি ওঁদের জন্য আমাদের গর্ব হয়। তাছাড়া দু'জনকে হারিয়ে আমরা কয়েক লক্ষ পরিজন পেয়েছি।

স্বস্তিকা : একজনের বয়স ২২। আরেকজন ২০। দুই ভাই প্রভু শ্রীরামের জন্য আত্মবলিদান দিলেন। হিন্দুধর্মের জন্য কিছু করার আকাঙ্ক্ষা বা এই জাগরণ রাম-শরদের মধ্যে কীভাবে এলো?

পূর্ণিমা : খুব ছোটো থেকেই দাদারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। তখন তাঁদের বয়স ৮ আর ৬। খেলাধুলোয় তুখোড় ছিলেন। মধ্যপ্রদেশের বেতুলে বিদ্যাভারতী পরিচালিত স্কুল ভারত ভারতীর শিক্ষাই দাদাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের ভিত গড়ে দিয়েছিল। তারপর কলকাতায় এসে নিয়মিত শাখায় যাওয়া শুরু করেন। আমাদের বাড়িতেও একটা পরিবেশ আছে। বংশপরম্পরায় সেই সংস্কারও তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। ছোটো থেকেই দুজনের মধ্যে প্রখর দেশভক্তি ছিল।

স্বস্তিকা : সেই সময় সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা অন্যান্য হিন্দু সংগঠনগুলি থেকে কেমন সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

পূর্ণিমা : রামমন্দির আন্দোলনে আত্মবলিদান দিয়েছেন কোঠারী পরিবারের দুই পুত্র। তার জন্য যথাযথ সম্মান আমরা পেয়েছি। সারা দেশের হিন্দুরা আমাদের পাশে থেকেছে। সারা দেশ থেকেই আমরা সহানুভূতি পেয়েছি। দু'বছর আগে রামজন্মভূমিতে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানেও আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তার জন্য আমরা সম্মানিত বোধ করি। এছাড়া যদি আর্থিক সহযোগিতার কথা বলেন, আমার বাবা এসবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আমি বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনে কাজ করছি। সংস্কার ভারতী, দুর্গা বাহিনী, কল্যাণ আশ্রম। বাবাও সংগঠনে সময় দিয়েছেন।

আমাদের মনে হয়েছিল, দাদাদের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে যদি কিছুটা সময় আমরা দিতে পারি তাহলে তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে। রাম-শরদ ভাইয়েরা নিজেদের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করে গেছেন।

স্বস্তিকা : সেই সময়ের যারা প্রথম সারির হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন, তাঁরা কতটা এগিয়ে এসেছিলেন?

পূর্ণিমা : সেই সময়ের সমস্ত বড়ো বড়ো নেতাই আমাদের পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। অটলজী তো ছিলেনই। সেই সঙ্গে আদবানীজী, মুরলীজী, সঙ্ঘের সুদর্শনজী, রজ্জু ভাইয়া, কেশব দীক্ষিতজী সবাই পরিবারের মতোই আমাদের সামলে রেখেছেন। উমা ভারতীজী আমার অভিভাবকের মতো হয়ে গিয়েছিলেন ওই সময়ে।

স্বস্তিকা : বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যেভাবে এখানে সংখ্যালঘু তোষণ চলছে, বাংলাদেশে হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার কি মনে হয় না রাম-শরদের আত্মবলিদানের কথা আরও বেশি করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত? তার জন্য কি কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে?

পূর্ণিমা : দেখুন, উদ্যোগ তো অনেক কিছুই নেওয়া উচিত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী আজও সঙ্ঘের বা অন্য কোনও সংগঠনের পক্ষ থেকে তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এজন্য একটু খেদ হয়। আজও রামমন্দির আন্দোলনের কথা উঠলেই সাংবাদিকরা প্রথমেই আমাদের বাড়িতে দৌড়ে আসেন। দু'তিন বছর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল ঘোষণা করেছিলেন রাম-শরদের স্মৃতিতে কিছু একটা করবেন। কিন্তু বাস্তবে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। অযোধ্যায় বলা হয়েছে একটা রাস্তার নাম এবং মন্দিরের করিডোরে বলিদানীদের স্মৃতিতে ফলক বসানো হবে। সেসব এখনও প্রসেসের মধ্যে রয়েছে।

স্বস্তিকা : কিন্তু যারা আত্মবলিদান দেন তাঁরা বা তাঁদের পরিবার কী কোনও স্বীকৃতির প্রত্যাশা করেন?

পূর্ণিমা : না করেন না। তবে একটু আগে আপনিই নতুন প্রজন্মকে তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করার কথা তুললেন। সেকাজ করতে হলে তো বলিদানীদের স্মৃতি সংরক্ষিত করা বাধ্যতামূলক। দীর্ঘ ৩২ বছরে কোঠারী ভাইদের আত্মত্যাগের ওপর একটা বইও লেখা হলো না। কারও কোনও উদ্যোগই নেই। বারুইপুরে একটা ৬ বছরের বাচ্চা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল। জানেন কি তার নামে সেই রাস্তার নাম হয়েছে শাহজাহান রোড? আর কোঠারী ভাইদের বলিদান তো ভারতের ইতিহাসে অনেক উচ্চমাত্রার। সেসব ভুলে গেলে আমাদের চলবে না। ■

গৌতমবুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের আলোচনা সভা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৪ ও ৫ মার্চ গ্রেটার নয়ডা গৌতমবুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিনের সর্বভারতীয় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'ধর্মান্তরণ ও সংরক্ষণ।' আলোচনা সভায় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি, গবেষক, অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও ব্যক্তি তার পূর্বের উপাসনাপদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নতুন উপাসনাপদ্ধতি গ্রহণ করে, এজন্য সে সংরক্ষণের লাভ পেতে পারে না। পদ্মশ্রী মিলিন্দ কুম্বলে বলেন, যাদের কম প্রতিনিধিত্ব ছিল তাদের অর্থাৎ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সমাজের লোকেদের প্রয়োজনে সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ধর্মান্তরিতদের সংরক্ষণের আওতায় আনার কথা যারা বলছেন

সমাজসেবী-সহ মোট ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকরী সভাপতি আলোক কুমারজী আলোচনা সভার উদ্দেশ্য তুলে ধরে আলোচনার সুর বেঁধে দেন। ধর্মান্তরিত মুসলমান ও খ্রিস্টানরা (এসসি) সংরক্ষণের আওতাভুক্ত হবেন কিনা— এই বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা তাঁদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। অনুসূচিত জাতি কমিশনের সহ সভাপতি অরুণ হালদার বলেন, শোষিত , পীড়িত, বঞ্চিত মানুষদের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল; ধর্মান্তরিত মুসলমান, খ্রিস্টানদের তার সুযোগ দিলে সত্যিকারের যাদের প্রয়োজন তারা বঞ্চিত হবেন। ৫ তারিখ সমাপ্তি অধিবেশনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শিবশঙ্করজী বলেন, ধর্মান্তরিত তারা রাজনৈতিক লাভের কথা ভেবে বলছেন। এজন্য তাদের ধর্মান্তরিতদের সংরক্ষণের জন্য সংখ্যালঘু কমিশনের কাছে দরবার করা দরকার। অধ্যাপক সুরেন্দ্র জৈন বলেন, মিম-ভীম স্লোগান অনুসূচিত জাতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র। তাদের মনে যদি ধর্মান্তরিতদের (এসসি) প্রতি ভালোবাসা থাকত তবে তারা সংখ্যালঘু বৃত্তির ভাগ দেয় না কেন? আলোচনা সভা বিচারপতি কে জি বালকৃষ্ণন কমিশনের নির্ধারিত বিষয়ের ওপর চালানো হয়। শেষে, সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, ধর্মান্তরিত মুসলসান, খ্রিস্টানদের অনুসূচিত জাতির(এসসি) সংরক্ষণের ভাগ দেওয়া হবে না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৬জন অংশগ্রহণ করেন। কলকাতা থেকে ক্ষেত্রীয় সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার আলোচনা সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন।

তারাশঙ্কর-স্মরণে আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা

তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের উদ্যোগে এবং বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষ স্মরণে গত ২৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি বীরভূমের সিউড়িতে অনুষ্ঠিত হলো দুদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা। নির্ধারিত বিষয় ছিল 'তারাশঙ্করের সাহিত্যদর্শনে দেশ-কাল-সমাজ ও রাষ্ট্র'। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তারাশঙ্কর বিশেষজ্ঞ ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের ড. রঞ্জন সাহা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ড. রাহেল রাজীব মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বজিৎ রায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামলচন্দ্র দাস, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নবগোপাল রায় এবং রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গৌতম মুখোপাধ্যায়।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তারাশঙ্কর-পৌত্র অমলশঙ্কর এবং প্রপৌত্র অনিন্দ্য। তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের সম্পাদক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় স্বাগত ভাষণে অতিথিদের অভিনন্দন জানান এবং আলোচনা সভার উদ্দেশ্য নিবেদন করেন।

ধর্ম জিজ্ঞাসা— সাত

দেবতা হয়ে ওঠাই হিন্দুধর্মের সাধনা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।' এ কেবল কলির কল্পকথা নয়, এ হলো বৈজ্ঞানিক সত্য। এ হলো এক উপলব্ধি। এই উপলব্ধি বা অনুভবেই ভারতের সুপ্রাচীন প্রজ্ঞার ঘোষণা— মানুষের অন্তরে রয়েছেন দেবতা। তিনি থাকেন ঘুমিয়ে। সেই নিদ্রাভিভূত দেবত্বকে জাগিয়ে তোলাই সনাতন ভারতের সাধনা। সেটাই আদর্শ। দেবত্বের জাগরণই মানবজীবনের লক্ষ্য।

আর প্রশ্নটাও সেখানেই। কে বা কারা এই দেবতা? কোনো অমরার অধিবাসী তাঁরা? কী তাঁদের স্বরূপ? তাঁরা অমর— কিন্তু চিরকালের জন্যই কি? কল্পান্তেও কি তাঁরা থাকেন বর্তমান?

এই সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে গেছেন প্রাচীন ঋষিরা। তাঁদের কথা, এই মরজগতের মানুষের মতো মরণশীল নন দেবতারা। কিন্তু তাঁরাও অক্ষয়, অদ্বয় নন। কল্পান্তে তাঁদেরও হয় লয়। তবে এ লয় নিঃশেষ হওয়া নয়, এ হলো একরকম নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা। নতুন কল্পে নতুন ভাবে জেগে ওঠেন তাঁরা— অথবা বলা যায় সক্রিয় করা হয় তাঁদের। তাঁদের দেখা যায় স্বরূপে।

এই প্রসঙ্গে বলা হয়, যে অনন্ত অবিনশ্বর নিত্য পরব্রহ্মের অংশ তাঁরাও। ব্রহ্মই স্রষ্টা হিসেবে নিজেরই সৃজন লীলার পরমানন্দ উপভোগের জন্য অন্যান্য সব কিছুর সঙ্গে দেবতাদেরও সৃষ্টি করেন। সোজা কথায়— যে পরব্রহ্মের অংশ মানুষ, দেবতারাও সেই তাঁরই অঙ্গীভূত। কেবল কর্মের কারণেই দেবতারা এক বিশেষ গুণের আধার। সেই গুণ, সেই কর্ম বা জীবনযাপনই তাঁদের কল্পান্ত পর্যন্ত করে অমৃতভোগী— অমরত্ব স্বাদের অধিকারী করা হয় তাঁদের।

দেবতা, দেব, দেবী ইত্যাদি শব্দগুলির মূলে রয়েছে 'বিদ্' ধাতু। বিদ্ ধাতুর রয়েছে নানা অর্থ। 'প্রকাশ পাওয়া' তারই একটি। ওই অর্থের বিস্তারে বলা হয় যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর— স্বপ্রকাশ তিনিই দেবতা। এই দেবতা এবং দেব শব্দ দুটির মধ্যেই অবশ্য কোনো পার্থক্য নেই। 'দেব এক দেবতা'— যিনি দেব, তিনিই দেবতা। অর্থাৎ দেব ও দেবতা অর্থের দিক থেকে অভিন্ন।

দেবতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়, যিনি দান করেন, তিনিই দেবতা। যিনি প্রকাশিত হয়ে অন্যকে প্রকাশ করেন তিনিই দেবতা। দেবতা স্বয়ংজ্যোতি— সেই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন অন্যকে। বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন রূপে দেখা যায় দেবতাদের। এই ভাবে ব্যক্ত দেবতারা সেই এক অব্যক্ত, অদৃশ্য পরব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'— এক তিনি, বিজ্ঞজনেরা বহুভাবে বলেন।

বেদের বিভিন্ন সূক্তে আছে নানা দেবতার নাম। কিন্তু বৈদিক ব্যাকরণ ও অভিধানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলক যাস্কের অভিমত— এইসব দেবতার মধ্যে প্রধান হলেন তিনজন— অগ্নি, ইন্দ্র বা বায়ু ও সূর্য। এই তিন দেবতার এক একটি অবস্থা এবং কাজকেই ডাকা হয় এক এক দেবতা বলে। আর সে কারণেই বেদে তিন নয়, দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ জন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। তবে দু' জায়গায় দেবতার সংখ্যা ৩৩৩৯ এমন উল্লেখও করা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে অবশ্য দেবতার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

পুরাণের দেবতারা অদিতির সন্তান। তাঁদের অবয়ব মানুষেরই মতো। তবুও তর্ক, এই দেবতারা সাকার, না নিরাকার? দেবতারা শরীরী নাকি অশরীরী? এইসব নিয়ে আছে নানা মত। পরে অবশ্য বলা হয়েছে; দেবতারা সাকার আবার নিরাকারও। স্বরূপ বিচারে দেবতারা সাকার আবার যজ্ঞ ইত্যাদির সময় যজমানের কাছে দেবতারা অদৃশ্য। সে সময় তাঁরা নিরাকার। এ এক অপূর্ব সমন্বয়। এবং এটাই হিন্দুধর্মের এক তুলনারহিত বৈশিষ্ট্য।

সাকার হোক, আর নিরাকার হোক, হিন্দুর ধর্মসাধনার কেন্দ্রে রয়েছে দেবতা। সেই দেবতার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হিন্দুর সব কর্ম,

সাধনা। হিন্দুর কাছে দেবতাই সব। প্রতিটি হিন্দু চেষ্টা করেন সজ্ঞানে অথবা অবেচতন ভাবে অন্তরস্থিত দেবতাকে জাগ্রত করতে। হিন্দুর সব ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ সেটাই।

হিন্দুর দেবতা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন আজানদেব এবং কর্মদেব। আজানদেব তাঁরাই— যাঁদের দেবত্ব লাভ করার জন্য কোনো পুণ্য কাজ বা তপস্যা করার প্রয়োজন পড়েনি। যাঁরা জন্মরহিত। তাই তাঁদের বলা হয় স্বতঃসিদ্ধ দেবতা। এই শ্রেণীর দেবতার মধ্যে আছেন অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, সোম, রুদ্র, মরুৎ, বিষ্ণু, উষা, বাক্ প্রভৃতি। দেবতা হিসেবেই তাঁদের আবির্ভাব।

অন্যদিকে যাঁদের কর্মদেবতা বলা হয়, তাঁদের জন্ম এই মরলোকে। তাঁরা নানারকম পুণ্যকর্ম করে, দীর্ঘ তপস্যা করে শেষ পর্যন্ত দেবতা হয়েছেন। এই শ্রেণীর পূজিত দেবতার সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। এই কর্ম দেবতা হিসেবে স্বীকৃত দেবতার মধ্যে আছেন; অশ্বিনী কুমাররা এবং ঋভুগণ দেবমণ্ডলী। এখানে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। কর্মদেব পর্যায়ের দেবতারা কোনো সময়ই একক নন। যমজ অথবা সমষ্টিগত ভাবেই দেখা যায় তাঁদের। এবং সেই রূপেই তাঁরা হয়ে ওঠেন দেবতাদেরও দেবতা। এবং তারই জন্য তাঁরা বিশেষ ভাবে বন্দনীয় এই মরলোকে সর্বত্র।

অশ্বিনীকুমাররা দেবতা। দেবলোকেরও চিকিৎসক তাঁরা। বিভিন্ন সময়ে দেবতাদেরও নানা কাজের সহযোগী তাঁরা। তবুও দেবসমাজে তাঁরা ছিলেন কিছুটা উপেক্ষিত। বিশেষ করে তাঁদের প্রতি ইন্দ্রের বিরাগটা ছিল একটু বেশি মাত্রায়। এই বিরাগের মূলে অবশ্য ছিল এক ধরনের কৌলিন্য বা বংশগৌরবের অহমিকা বোধ। তাঁরা জাত দেবতা। দেবতা হয়েই জন্মেছেন তাঁরা। তাই তো সোমে তাঁদেরই একমাত্র অধিকার। সে অধিকার হাত ছাড়া করতে মোটেই রাজি নন তিনি। আর তা নিয়েই বিরোধ। অপরকে হিংসা করতে গিয়ে প্রায় জীবন যেতে বসেছিল তাঁর। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কিছুটা প্রাণের দায়েই 'উদার' হয়েছিলেন ইন্দ্র। অশ্বিনীকুমারদের সঙ্গে একই পঙ্ক্তিতে বসে সোম পান করেছিলেন তিনি। মরলোকে যজ্ঞে নিবেদিত হয় যে সোম, অগ্নি যা বহন করে আনেন অমরালোকে দেবতাদের জন্য, সেই সোম পানের অধিকার তিনি দিতে বাধ্য হলেন অশ্বিনীকুমারদের। মাথা নীচু করতে বাধ্য হলেও গজরাতে থাকেন তিনি আপন মনে। অশ্বিনীকুমারদের অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। নিজেদের তপস্যার মূল্যে অর্জন করেছেন যে দেবত্ব শেষ পর্যন্ত দেবরাজ ইন্দ্র যে তাকে স্বীকৃতি নিয়েছেন তাতেই খুশি তাঁরা। সেই খুশিতেই কী দেবলোক, কী মানব লোক, সর্বত্রই সকলের হিতকামনায় সদা তৎপর তাঁরা। সে কোনো ব্যাধি হোক অথবা হোক অন্য কোনো বিপদ, সবক্ষেত্রেই সমান আন্তরিকতায় সদা তৎপর তাঁরা।

কাহিনি, তাঁরা দু'জনে ছিলেন মর্ত্যের মানুষ। দু'জনেই ছিলেন রাজা। রাজকার্য করতেন শাস্ত্রবিধি মেনেই। শোষণ নয়, প্রজাদের মঙ্গল কামনাই করতেন সবসময়। দান-ধ্যান, যজ্ঞ-তপস্যা ছিল তাঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী। পৃথিবীতে যত রকম পুণ্যকাজ করা যায়, সবই করেছিলেন তাঁরা।

তাঁদের মহত্ব, নানা পুণ্যকর্ম, সদাচার, সত্য পথে বিচরণ, সবরকম সেবাকর্মে সমর্পিত প্রাণ হওয়ার কারণেই তাঁরা মানুষ থেকে উন্নীত হন দেবতায়। অন্তর্নিহিত দেবত্বকে জাগিয়ে তোলার কারণেই তাঁরা অমরার দেবতাদের মতোই হয়েছিলেন দেদীপ্যমান। তাঁরা হন কর্মদেবতা।

কর্মদেব তাঁরা। তবুও বহুক্ষেত্রে বিশেষ করে রোগ চিকিৎসা এবং নানা ধরনের সৃজন কর্মে তাঁরা বহু ক্ষেত্রে জাতদেবদের চেয়েও এগিয়ে ছিলেন অনেকটাই। অন্যরা সেটা মেনে নিলেও স্বভাব অহংকারী ইন্দ্র সেটা মেনে নিতে পারেননি। একরকম জোর করেই দেবতাদের যা প্রাপ্য সেই সোমপানের অধিকার দেননি তাঁদের। এ কারণে অশ্বিনীকুমার দ্বয় মানসিকভাবে যথেষ্টই কষ্টে ছিলেন। তাঁরা জানতেন, ইন্দ্র অবিচার করছেন তাঁদের প্রতি। কিন্তু কীভাবে এর প্রতিকার করবেন তার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না কিছুতেই। আর সে কারণে নিজেদের কাছে একটুকু ফাঁকি না দিয়েও নীরবেই চোখের জল ফেলতেন তাঁরা। আর প্রার্থনা করতেন দেবতাদেরও দেবতা যিনি সেই পরমেশ্বরের কাছে। নীরব সেই প্রার্থনা ছিল কিছুটা অনুযোগের সুর— যদি দেবতা পদে অভিষিক্তই করলে তাহলে বঞ্চিত রাখলে কেন দেবতাদের যে অধিকার সেই সোমপান থেকে।

তাঁদের এই কান্নায় দ্রব হলো পরমেশ্বরেরও মন। অশ্বিনী কুমারদেরও সোমপান করার একটা সুযোগ করে দিলেন তিনি। সকলের অলক্ষেই রচিত হলো এক চিত্রনাট্য। যা এক কথায় অভিনব।

মহর্ষি চ্যবন। ভৃগু ও পুলোমার ছেলে তিনি। সেই ছেলেবেলা থেকেই নর্মদার কাছে বৈদূর্য পাহাড়ে তপস্যারত তিনি। দিন-মাস-বছর চলে যায়, তপস্যা শেষ হয় না তাঁর। তপস্যায় স্থিরচিত্ত তিনি। কিন্তু সময় তো স্থির নয়, তা তো এগিয়ে চলে নদীর স্রোতের মতোই। তাই বাল্য থেকে যৌবন পেরিয়ে একসময় বার্ধক্যে পৌঁছে যান তিনি। জরা থাবা বসায় তাঁর দেহে। একই জায়গায় একচিত্তে, একই আসনে অনড় হয়ে তপস্যা করার সময় তাঁর দেহ ঘিরে উইয়ের দল বাসা বাঁধতে থাকে। একসময় সুবৃহৎ বল্মীকস্তূপ বা উইঢিপির নীচে চাপা পড়ে তাঁর দেহ। কোনো দিকেই হুঁশ নেই তাঁর তখন। তাঁরই মধ্যে ঘটল এক অঘটন।

রাজা শর্যাতি সেদিন তাঁর চার হাজার স্ত্রী আর মেয়ে সুকন্যাকে নিয়ে এসেছেন ওই বৈদুর্য পাহাড়ে বিহারের জন্য। উইঢিপির মধ্য থেকে সুকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হন চব্যন। ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি ডাকেন সুকন্যাকে। সে ডাক পৌঁছয় না সুকন্যার কানে। বরং কৌতূহলী সুকন্যা ওই উইঢিপির মধ্যে টিপ টিপ করা চ্যবনের চোখ দুটির মধ্যে কাঁটা ফুটিয়ে নষ্ট করে ফেলে তা।

দৃষ্টিহারা চ্যবনের ক্রোধে এবার রুদ্ধ হয়ে যায় রাজসৈন্য-সহ সকলের মলমূত্র নিঃসরণ। রাজা শর্যাতি বুঝতে পারেন, নিশ্চয় কেউ কোনো পাপকর্ম করেছে। আর তাই কোনো মহর্ষির ক্রোধে এমনটা হচ্ছে।

খোঁজ নিতে গিয়ে রাজা দেখেন, সুকন্যাই করে বসেছে এই গর্হিত কাজ। ভীতসন্ত্রস্ত রাজা চ্যবনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। চ্যবন বলেন, সুকন্যা তাঁকে বিয়ে করে তাঁর এই অন্ধজীবনের দায়িত্ব নিলেই ক্ষমা করবেন তিনি। নচেৎ—

নিরুপায় রাজা শর্যাতি বাধ্য হয়েই সুকন্যার বিয়ে দেন ঋষি চ্যবনের সঙ্গে। সুকন্যাও নিজের ভুল বুঝতে পেরে সেখানে তাপসী রূপে সেবা করতে থাকেন বৃদ্ধ অন্ধ স্বামী চ্যবনকে।

এরই মধ্যে অশ্বিনীকুমাররা সুকন্যার নিরাভরণ দেহের রূপে মোহিত হয়ে তাঁদের একজনকে বিয়ে করতে বলেন তাকে। কিন্তু সুকন্যা রাজি হয় না কিছুতেই। অশ্বিনীকুমাররা বলেন, সুকন্যা তাঁদের একজনকে বিয়ে করলে তাঁরা চ্যবনের দৃষ্টি ও যৌবন দুই-ই ফিরিয়ে দেবেন।

এ কথায় সুকন্যা দ্বিধায় দুলতে থাকেন। কী করবেন বুঝতে না পেরে চ্যবনকেই খুলে বলেন সব। চোখ ও যৌবন ফিরে পাবার আশায় চ্যবন তখন চঞ্চল। অশ্বিনীকুমারদের কথাই মেনে নিতে বলেন সুকন্যাকে। স্বামীর আদেশ মেনে নেন সুকন্যা।

তারপর যা ঘটল তাকে অলৌকিকই বলা যায়। চ্যবনকে নিয়ে অশ্বিনীকুমাররা ডুব দিলেন নর্মদায়। উঠেও এলেন তিনজন। সুকন্যা দেখেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনজন যুবক। অপরূপ দর্শন ত্রয়ী যেন একই ছাঁচে ঢালা মূর্তি। হুবহু একই রকম তিনজন। আলাদা করা যায় না কাউকে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুকন্যা, ক্ষণকালের জন্য। তারপর নিবিড় অনুধ্যানে চিনলেন স্বামীকে। বরণমালা দিলেন চ্যবনেরই গলায়। সুকন্যার একনিষ্ঠতায় তুষ্ট অশ্বিনীকুমাররা। আশীর্বাদ করেন তাকে। সেই সঙ্গে চ্যবনকে জানান তাঁরা কীভাবে বঞ্চিত তারা সোমপানের অধিকার থেকে।

নবযৌবনে দীপ্ত চ্যবন কৃতজ্ঞতায় অশ্বিনীকুমারদের সোমপানের অধিকার দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কথা মতো রাজা শর্যাতিকে দিয়ে এক সোমযজ্ঞ করালেন চ্যবন। নিজে হলেন সেই যজ্ঞের ঋত্বিক। যজ্ঞে উপস্থিত সব দেবতা। এলেন ইন্দ্রও। যজ্ঞে তাঁদের সকলের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদেরও সোমপাত্র দিতে গেলে বাধা দেন ইন্দ্র। বলেন, এঁরা দেববৈদ্য। সবসময় মানুষের সঙ্গ করেন। এঁরা সোমপানের অধিকারী নন। চ্যবন কিন্তু সে কথায় কান দেন না।

ক্রুদ্ধ ইন্দ্র এবার তাঁর হাতের বজ্রটি ছুঁড়তে যান। চ্যবনও পালটা মন্ত্রবলে সৃষ্টি করেন 'মদ' নামে এক কৃত্যার। মদ গিলে ফেলে ইন্দ্রের বজ্র। তারপর গিলতে যায় ইন্দ্রকেই। অসহায় ইন্দ্র ক্ষমা চান চ্যবনের কাছে। সেই সঙ্গে বলেন, অশ্বিনীকুমাররাও এবার তাঁদের সঙ্গেই হবেন সোমপায়ী। যা ছিল একটি স্বাভাবিক অধিকার এবার সেটাই দিলেন ইন্দ্র অযথা কিছু জল ঘোলা করে নিতান্তই নিজের প্রাণের ভয়ে। একটি অহমিকার মৃত্যু হলো আরেকটা সম্ভাব্য মৃত্যুর মুখে।

এতো গেল পুরাণের কথা। অশ্বিনীকুমাররা কিন্তু বেদের দেবতা। গুরুত্ব ও মহিমায় ইন্দ্র, অগ্নি, সোম ও বরুণ এই চারদেবতার পরই অশ্বিনীকুমারদের স্থান। সূক্ত সংখ্যার দিক থেকে হিসেব করলে ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি ও সোমের পরেই অশ্বিনীকুমারদের সম্পর্কিত সূক্তের স্থান। সংখ্যাটা পঞ্চাশেরও বেশি। বেদের কথা, অশ্বিনীকুমাররা হলেন দ্যুস্থানের অর্থাৎ স্বর্গের দেবতা। ঋগ্বেদে নানা সূক্তে ৩৯৮ বার তাঁদের কথা বলা হয়েছে।

বেদের কথায় অশ্বিনীকুমাররা হলেন বিবস্বান ও সরণ্যুর যমজ সন্তান। সরণ্যুর বাবা ত্বষ্টা। বিয়ের পরই সরণ্যু অদৃশ্য হয়ে যান। রেখে যান তাঁরই মতো দেখতে অন্য এক নারীকে। পুরাণে ইনিই হলেন সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা বা সাবিত্রী এবং তাঁরই অনুরূপ নারী ছায়া।

পুরাণ মতে, সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা চলে যান। বৃহৎদেবতা-তে এই কথায় বলা হয়েছে আরও একটু বিস্তারে। সরণ্যু তাঁর অনুরূপ ছায়াকে রেখে পালিয়ে সূর্যালয় থেকে, এক ঘোটকী রূপে তিনি চলে যান উত্তর কুরুবর্ষে। সূর্য কিন্তু ঘোটকীরূপী সরণ্যুকে চিনতে পারেন। তাই অশ্বের রূপ নিয়ে তিনি তাঁর পিছু নেন। সরণ্যুর দেখা পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে যান। কিন্তু 'তয়োঃবেগেন' তাঁর বীর্য মাটিতে পড়ে যায়। গর্ভ কামনায় অশ্বরূপী সরণ্যু সেই বীর্য ধারণ করে জন্ম দেন দুই পুত্র নাসত্য ও দস্র। এঁরাই সকলের কাছে পরিচিত হন অশ্বিনীকুমার নামে। তাঁরা হন স্বাস্থ্য ও ভেষজের দেবতা। হলেন দেববৈদ্য। নিরুক্তর (১২।১।৪) মতে এঁরা দুই পুণ্যবান রাজা। কৃষ্ণ যজুর্বেদে (৭।২।৭) বলা হয়েছে এঁরা হলেন দেবতাদের অনুজ ও অন্ত্যজ বা অবর। তবুও আগে এঁদেরই প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। যাস্কের মতে এঁরা হলেন দ্যুস্থানের প্রধান দেবতা। এঁদের কেউ দ্যাবা-পৃথিবী, কেউ দিনরাত, কেউ-বা চন্দ্রসূর্য বলে মনে করেন।

এই দুই দেবতা উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণের। এঁরা হলেন কল্যাণের অধিপতি। এঁদের রথও সূর্যের মতোই উজ্জ্বল ও হিরণ্ময়। সেই রথের রং মধুর মতো। রথটিও মধুতেই পরিপূর্ণ। ত্রি-চক্র ওই রথটি টেনে নিয়ে যায় কখনও অশ্ব, কখনও কোনো বিশাল বিহঙ্গ, কখনও পক্ষীরাজ ঘোড়া। সুগন্ধি স্নিগ্ধ পদ্মমালা শোভিত দুই অশ্বিনীকুমার কখনও কখনও তাঁরা একশো দাঁড়ের জলযানে সমুদ্রে শোভমান।

ঋগবেদেরই দুটি সূক্তে বলা হয়েছে অশ্বিনীকুমাররা রুদ্র ও সিন্ধুর যুগলপুত্র। স্বয়ংবর সভায় সূর্যের মেয়ে সূর্যা এঁদের গলাতেই দিয়েছিলেন মালা। সূর্য অবশ্য জামাতা হিসেবে সোমকে পছন্দ করেছিলেন। তাই দেবতারা এসেছিলেন অশ্বিনীকুমারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। কিন্তু তাঁরা পর্যুদস্ত হলে সূর্য কিছুটা বাধ্য হয়েই অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন।

অশ্বিনীকুমাররা চিরযুবক ও অদ্ভুতকর্মা। চিকিৎসক হিসেবে তুলনারহিত। তাঁদের চিকিৎসায় অন্ধরাও দৃষ্টি ফিরে পান, অসুস্থরা সুস্থ হন, এমনকী কাটা পা জোড়া লাগাতে বা মৃতকেও জীবিত করতে পারতেন তাঁরা। অন্যদিকে তাঁরা ছিলেন অসাধারণ যোদ্ধা। বিশ্বক অসুর এবং তার বংশকে বিনাশ করেছিলেন তাঁরা। ইন্দ্রকে সাহায্য করার খণ্ডযুদ্ধ করে বিপর্যস্ত করেন নমুচিকে। একই সঙ্গে সৃজন কর্তা হিসেবে তাঁরা তৈরি করেছেন নানা রথ ও যন্ত্র। খরার সময় আকাশ থেকে বৃষ্টি নামানোর বিদ্যাও জানতেন তাঁরা। কিন্তু মানবিকতা তাঁদের সবচেয়ে বড়ো গুণ। বস্তুত মানবসেবায় নিবেদিতপ্রাণ হয়েই তাঁরা হয়েছিলেন দেবতা।

অশ্বিনীকুমারদের মতোই আঙ্গিরসের পৌত্র সুধন্বার তিন ছেলে ঋভু বা ঋভুক্ষিন, বিভ্বন এবং বাজও মানুষ হয়েও তাঁদের শিল্পকুশলতা এবং মানব সেবার গুণেই সম্মিলিত ভাবে ঋভুগণ নামে দেবত্বে উন্নীত হন। রথ নির্মাণ এবং তাকে সুখপ্রদ করার কাজে তারা ছিলেন অতি দক্ষ। তাঁরা ইন্দ্রের জন্য স্বশিক্ষিত অশ্ব, বৃহস্পতির জন্য ক্ষীরক্ষরা গাভী তৈরি করে দেন। নিজেদের বাবা মা-কেও যৌবন ফিরিয়ে দেন। এইসব সৃজন কর্ম এবং গভীর তপস্যার বলে এঁরা দেবতা হয়ে ওঠেন। তখন আজানদেবরাও তাঁদের পুজো করেন। এঁরা ছিলেন ত্বষ্টার মতোই শিল্পী। তাই এঁরা ইন্দ্রের সখা হন, পান সোমপানের অধিকার। এঁরা সকলকে অন্ন এবং সম্পদ দান করেন। আর সে কারণে অবর দেবতা হয়েও তাঁরা হন দেবতাদেরও দেবতা।

এইসব কাহিনি প্রমাণ করে, হিন্দুর দেবতারা সকলেই জন্ম থেকেই অমরাবতীর অধিকারী নন। এই মর্ত্যের মানুষও সেবা, তপস্যা, সৃজন ক্ষমতা ও সুকর্মের মধ্য দিয়ে দেবত্বে উন্নীত হন। হয়ে ওঠেন অনেক সময় দেবতাদেরও পূজনীয়। এটাই হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব। মানুষকে কর্মের মাধ্যমে দেবতা করে তোলাই হিন্দুধর্ম ও সাধনার বৈশিষ্ট্য। ☐

আমাদের দেশের নামকরণ ও মহিমা

ডাঃ দিপীপ কুমার সরকার

স্বয়ম্ভু মনু থেকে মানব সৃষ্টি আরম্ভ হয়। মনু ও শতরূপার দুই পুত্র উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রত। কনিষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রত— রাত্রিকে দিনের মতো আলোর ইচ্ছার্থে জ্যোতির্ময় রথে চড়ে সাতবার সারা বিশ্বে পরিক্রমা করেন— যার পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তসিন্ধুর জন্ম হয় এবং নিকটবর্তী ক্ষেত্রসমূহ সাত মহাদ্বীপ নামে খ্যাত হয়। যথা— জম্বুদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ, শাল্মলিদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ ও পুষ্করদ্বীপ।

তিনদিক সমুদ্রের দ্বারা আবেষ্টিত হওয়ার দরুন ভৌগোলিক দিক থেকে জম্বুদ্বীপ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রিয়ব্রতের তিন পত্নী এবং দশজন পুত্র ছিল। দশ পুত্রের মধ্যে কবি, সরণ তথা মহাবীরের সংসার ধর্মে আসক্তি না থাকাতে বাকি সাতজন সাত দ্বীপের অধিপতি হন। যথা : আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপের, ইধমজিহ্ব প্লক্ষদ্বীপের, যক্ষবাহু শাল্মলি দ্বীপের, হিরণ্যরেতা কুশদ্বীপের, ঘৃতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চ দ্বীপের, মেধাতিথি শাক দ্বীপের এবং বিতিহোত্র পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি হন।

উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব পাঁচবছর বয়সে ভগবান বিষ্ণুর দর্শনলাভ করেছিলেন। ধ্রুবের বংশজাত পৃথ্যু থেকে পৃথিবীর নাম হয়। জম্বুদ্বীপাধিপতি আগ্নীধ্রের নয়জন পুত্র। যথা : নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। জেষ্ঠ পুত্র পরবর্তীকালে অজনাভ নামে খ্যাত হন। নাভির একমাত্র পুত্র ঋষভদেবের একশত পুত্র। জ্যেষ্ঠ ছিলেন ভরত। তাঁর লোকপ্রিয়তা ও সদগুণের জন্যে জম্বুদ্বীপের নাম 'অজনাভ বর্ষ' থেকে ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হয়।

ভারতবর্ষের মহিমা :

আমাদের দেশে এমন এক যুগ ছিল যখন প্রতিটি লোক সৎ ছিল এবং সকলেই ধর্মপূর্বক সুখে জীবনযাপন করছিল। ওই সময়ে না কোনো রাজ্য ছিল, না কোনো রাজা ছিল; না দণ্ড ছিল, না দণ্ডদাতা ছিল, ধর্মই সমাজকে বেঁধে রেখেছিল। পিতামহ ভীষ্ম এই যুগ সম্বন্ধে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

'ন রাজ্যং ন চ রাজা আসীৎ
ন দণ্ডয়ো ন চ দাণ্ডিকঃ,
ধর্ম নৈব প্রজা সর্বাঃ
রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্।।'

কালক্রমে সমাজে অবক্ষয় দেখা দিতে লাগলো, সারা সমাজে অব্যবস্থা এলো, ধর্মের প্রতি গ্লানি, মানুষের লোভ অর্থাৎ জঙ্গলরাজ শুরু হলো। ফলে ঋষিরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ব্রহ্মার নিকটস্থ হয়ে তাঁদের অভিযোগ পেশ করলে ব্রহ্মা ঋষিদের সঙ্গে মনুর নিকট এসে বললেন, তোমাকে রাজা হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মনু রাজা হতে অস্বীকার করলেন— কারণ তাঁকে দণ্ড দিতে হবে, দণ্ডহেতু কাউকে মেরে ফেলতে হবে, কাউকে জেলে পাঠাতে হবে— এজন্য তাঁকে পাপের ভাগী হতে হবে।

এসব শোনার পর ব্রহ্মা বললেন এতে কোনো পাপ নয়— মানুষকে ধর্মের পথে চলার জন্যই তোমাকে এ দায়িত্ব নিতে হবে।

আমাদের দেশে রাজা সর্বোপরি নয়, ধর্মই সর্বোপরি। এই ভাবনার জন্যই আজও আমাদের স্থায়িত্ব সুরক্ষিত আছে।

বলা হয়ে থাকে —

'পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।

ফলং পাপস্য নেচ্ছন্তি পাপং কুর্বন্তি যত্নতঃ।।

অর্থাৎ মানুষ পুণ্যফল লাভ করতে চায়, কিন্তু পুণ্যকাজে ইচ্ছা থাকে না। পাপের ফলভোগ করতে চায় না, কিন্তু পাপ কাজ যত্নের সঙ্গে করে থাকে। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের মহিমা। ◻

রাজনীতিতে রং হারাচ্ছে ঘাসফুল

ভবানী শঙ্কর বাগচী

রাজ্য রাজনীতিতে ক্রমশ ফিকে হচ্ছে ঘাসফুলের রং। সাগরদিঘি উপনির্বাচনের হাতে আসা ফল তাতেই সিলমোহর দিয়ে গেল। ২০১১'র পর এই প্রথম সাগরদিঘি কেন্দ্রে হার মানল শাসকদল তৃণমূল। শুধু তাই নয়, মমতার মুসলমান তোষণের আঁটসাট ঘেরাটোপ ভেঙে সেই সংখ্যালঘু গড়েই আঘাত হানল কংগ্রেস। ১৯৭২ সালের পর আবার মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে ঘাঁটি গাড়ল 'হাত'। তাও আবার উপনির্বাচনে! চাট্টিখানি কথা নয়। কেননা ক্ষমতায় আসা ইস্তক প্রায় সবকটি উপনির্বাচনেই জয়ী হয়েছে জোড়াফুল। ব্যবধানও বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কিন্তু এবার যেন উলটপুরাণ। মাত্র দু'বছর আগে এই আসনেই ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটে জয় পেয়েছিলেন সুব্রত সাহা। মন্ত্রীও হয়েছিলেন। ২০১১ থেকে টানা তিনবার তৃণমূলের বিধায়ক হন তিনি। কাজেই এরকম একটা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয় নিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্তই ছিলেন ঘাসফুলের সুপ্রিমো। সেখানে হানা দিয়েই যে বাম সমর্থিত প্রার্থী কংগ্রেসের বাইরন বিশ্বাস একেবারে ২৩ হাজার ভোটে নাড়িয়ে দেবে শাসকদলকে তা কে জানতো!

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের যা ফলাফল, তাতে দেখা গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের ৬৯টি আসনে মুসলমান ভোটাররাই দিদিকে তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসতে সাহায্য করেছিল। ২৯৪ আসনের মধ্যে ৭৪ আসনে ৪০ শতাংশ মুসলমান ভোট। পুরোটাই পড়েছিল জোড়াফুল চিহ্নে। ২০১৬-র পর থেকে ২০২১ অবধি খবরের কাগজের পাতা ওলটালে চোখে পড়বে তৃণমূলের বড়ো বড়ো দুর্নীতির হেডলাইন। ডজন খানেক চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, টিভির পর্দায় জনপ্রতিনিধিদের হাত পেতে বান্ডিল বান্ডিল টাকা ঘুষ নেওয়ার 'নারদ কেলেঙ্কারি', বালি-পাথর-গোরুপাচার-সহ একাধিক দুর্নীতিতে তখনও তৃণমূলের ডাকসাইটে নেতা-মন্ত্রীদের কেউ কেউ হাজতবাস করছিলেন, কেউ আবার 'খালাস' হয়ে পুরনো পসার জমাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সির হাওয়া তখনও ছিল। সেই টানাটানির সংসারেও দিদিকে অক্সিজেন জুগিয়েছিল মুসলমানরা। তাই তিনি ওদের 'ঢালাও তোষণ নীতি' থেকে বেরিয়ে আসেননি। তিনি নিজেই সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন ভরা সভায়। বলেছেন, 'যে গোরু দুধ

ফঃ ৫

দেয়, তার লাথিও ভালো'। কিন্তু টিভির পর্দায় ফুটে ওঠা সদ্যসমাপ্ত সাগরদিঘি উপনির্বাচনের পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে তৃণমূল শিবিরের সঙ্গে ক্রমশ দূরত্ব বাড়াচ্ছে 'দুধেল গাই'রা।

এরাজ্যে তৃণমূলের পুঁজি যে একমাত্র মুসলমান ভোটব্যাংক, সেকথা বুঝতে তথ্য বা পরিসংখ্যান হাতড়াবার প্রয়োজন নেই। সংখ্যালঘুদের লেজ ধরেই বারবার নির্বাচনী বৈতরণী পেরিয়েছে তৃণমূল। সেই বাড়া ভাতেই ছাই মিশেছে ফুরফুরা শরিফের সংকটে। ২০১৯-এ ফুরফুরা শরিফের মসনদের দখলদারি নিয়ে দুই পিরজাদার লড়াইয়ে বিভক্ত হতে থাকে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ভোটব্যাংক। একদিকে পিরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি। আরেকদিকে আব্বাস সিদ্দিকি। দুই সিদ্দিকির ক্ষমতার দড়ি টানাটানির খেলায় ক্রমশ ফাটল ধরছে মমতার মুসলমান ভোটব্যাংকে। আর আখের গোছাচ্ছে বাম-কংগ্রেস। আব্বাসপন্থীদের অভিযোগ, পিরজাদা ত্বহা সিদ্দিকির ওপর তৃণমূলের নেকনজর থাকায় ফুরফুরায় একাধিপত্য কায়েম করেছেন তিনি। স্বজনপোষণের ঠেলায় মুসলমানদের কোনও উন্নয়ন তৃণমূল জমানায় হয়নি। তাই ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) নামে রাজনৈতিক দল গড়ে সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমোকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে আব্বাস সিদ্দিকিরা। তারাই এখন তৃণমূলের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক শত্রু। সম্প্রতি ধর্মতলায় পুলিশের সঙ্গে আইএসএফ সমর্থকদের সংঘর্ষে বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকিকে গ্রেপ্তার করে ৪০ দিন হাজতে আটকে রাখে পুলিশ। কারণে না অকারণে, তা নিয়ে বিতর্ক থেকেই যাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, খানিকটা হলেও আইএসএফ বিধায়কের গ্রেপ্তারি সাগরদিঘির ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে। অতএব, মমতার মমতায় বেড়ে ওঠা ফ্রাংকেনস্টাইন এখন তার দলকেই গিলে খাওয়ার জন্য তৈরি।

একুশের বিধানসভা ভোটে বিরোধীদের আরেক দফা হারিয়ে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতা নিজের দখলে রেখেছে কালীঘাট। কিন্তু ক্ষমতা দখলের উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই একের পর এক অঘটন কড়া নাড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসের সদর দপ্তরে। একুশের ফলাফল ঘোষণা হয় ২ মে। তার দিন পনেরো'র মধ্যেই পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, প্রয়াত পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র এবং প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। পরে অবশ্য জামিন পান তাঁরা। শিক্ষায় বেসামাল নিয়োগ দুর্নীতিতে বর্তমানে হাজতবাস করছেন হেভিওয়েট মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন দলের মহাসচিব। পার্থ'র বেহিসেবি সম্পত্তির কূলকিনারার খোঁজে নেমে ইডি তার গোটাছয়েক আস্তানায় 'টাকার পাহাড়' আবিষ্কার করেছে। ধরা পড়েছে পার্থর বান্ধবী অর্পিতা। একই সঙ্গে জেলের ভাত খাচ্ছেন এসএসসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশাসক কল্যাণময় গাঙ্গুলি-সহ অনেকে। শিক্ষার ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা! সদ্য শেষ হওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন একটি মিম খুব ভাইরাল হয়েছে-- 'এবছর মাধ্যমিকের কোনও প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। কারণ পুরো শিক্ষা দপ্তরটাই জেলের ভেতরে।'

শিক্ষা কেলেঙ্কারির জল যে কতদূর গড়িয়ে কোন্ আদিগঙ্গায় পড়বে, তা কেউ ঠাহর করতে পারছেন না। এরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছে ভারতের বিচারব্যবস্থা। প্রতিদিনই কোনও না কোনও ছোট-মাঝারি-বড়ো নেতা ধরা পড়ছেন সিবিআই-ইডির জালে। সেই সঙ্গে অগাধ টাকা। কোনও এক কুন্তল, তস্য বান্ধবী, তস্য নেতা আর কোটি কোটি নগদ। ২০১১-য় নবান্ন'র গদি আঁকড়ে ধরার সময় থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বলে আসছেন, 'কোষাগারে টাকা নেই। কেন্দ্র পাওনা মেটাচ্ছে না।' অর্থাৎ তহবিলের 'ভাঁড়ে মা ভবানী'। তবুও তিনি যাবতীয় 'শ্রী' ও 'ভাণ্ডার' চালিয়ে যাচ্ছেন। টাকা নেই বলছেন, অথচ ভাইদের ডেরায় খানাতল্লাশিতে বেরিয়ে আসছে কড়কড়ে বান্ডিল। মাগ্গিগণ্ডার দিনে এত টাকা কোথা থেকে আসছে, কার কাছেই-বা যেত, সেসব এখন গাঁয়ে গঞ্জের মুখ্যুসুখ্যু মানুষগুলোও জানতে চাইছে। বলাবাহুল্য, পার্থ চট্টোপাধ্যায়দের এই বেলাগাম দুর্নীতি দিদির ভাসমান তরীর গায়ে যে ছিদ্র করে দিয়েছে, তা ধীরে ধীরে বাড়ছে। ২০১১-য় বাম শাসনের পতনের মূলে একটা বড়ো কারণ ছিল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অসন্তোষ। সেই অসন্তোষের ঝড় আছড়ে পড়েছিল বামেদের পোস্টাল ব্যালটে। বেশিরভাগটাই গিয়েছিল মমতার ভাগে। কোঅর্ডিনেশন কমিটিও সেই ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে পারেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনেও সরকারি কর্মচারীদের সেই বিদ্রোহ আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। যার দমন বা সমাধান— দুটোতেই দিশেহারা শাসক দল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ২০২২-এর আগেও ডিএ নিয়ে আন্দোলন এতটা সক্রিয়ভাবে দেখা যায়নি। যতটা পার্থদের গ্রেপ্তারের পর দেখা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ থেকে সরকারি চাকুরে সবার কাছে একটা বার্তা পরিষ্কার। তৃণমূল কংগ্রেস যদি সিকিভাগ উন্নয়ন করে থাকে তাহলে বারোআনা বগলদাবা করেছে। তাই ট্রেজারিতে ক'আনা পড়ে আছে সেই ঢপবাজিতে চিড়ে ভিজছে না। তারা তাদের দাবির যোলোআনা আদায়ের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ—এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে দুর্নীতি করেনি শাসকদল। একেবারে নীচুতলা থেকে শুরু করে তা গিয়ে পৌঁছেছে ডগায়। রোজ নতুন নতুন দুর্নীতি আর কেলেঙ্কারির খবর শুনে রাজ্যবাসীর মন বিষিয়ে গেছে। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। এখন থেকেই জল মাপছে দিদি ও তার ভাইয়েরা। কিন্তু যে বাহুবলীরা একসময় এলাকা কাঁপাত, যাদের ভয়ে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত, তারা তো সব তড়িপার। কেষ্ট তিহাড়ে। আরাবুল নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর সব কেউকেটারা সন্ত্রস্ত হয়ে দোরে খিল এঁটেছে। কে জানে কখন দরজায় সিবিআই কড়া নাড়বে। কাজেই এবারের পঞ্চায়েত ভোট যে তৃণমূল সুপ্রিমোকে স্বস্তি দিচ্ছে না তা নিয়ে কানাঘুঁষো চলছে দলের অন্দরেই। ২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোটে সহায় ছিল কেষ্টবিষ্টুরা। তারা এখন গরাদের ওপারে। বন্দুকের নলের ডগায়, বোমাবাজি করে যে বিরোধীদের মনোনয়ন আটকানোর দিন শেষ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন শাসকদলের মাথারা। তাই কি সাগরদিঘির ফলাফল তাদের এতটা বিচলিত করছে? আসলে বলিউডের পিকে'র মতো তৃণমূলেরও একটা বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয়েছিল, 'সরফরাজ ধোকা নেহি দে সকতা'। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলছে।

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আরাবুল, অনুব্রত মণ্ডলদের নেটওয়ার্ক কাজ করেছিল পুরো রাজ্যজুড়ে। সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করে বিনা নির্বাচনেই অধিকাংশ পঞ্চায়েত দখল করেছিল শাসকদল। এবার কী হতে চলেছে তা তারা ভালো মতোই আঁচ করতে পারছেন। সেদিন পর্যন্ত এরাজ্যে বিরোধী দল

বলতে কিছু ছিল না। বিধানসভা ছিল কার্যত বিরোধীশূন্য। বিজেপি ২০১৯ লোকসভা ভোটে ১৮ টা আসন পাওয়ার পর থেকেই পালাবদলের একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। একুশের নির্বাচনের পর এ রাজ্যে বিজেপি মূল বিরোধী দল। শুধু তাই নয়, দুটি সংখ্যালঘু আসনও রয়েছে তাদের দখলে। কাজেই এরাজ্যের মানুষের মন পেতে খুব বেশি কসরত করতে হবে না বিজেপিকে। অন্যদিকে বাম-কংগ্রেস জোটের মডেল সাগরদিঘিতে কার্যকরী হওয়ায় তারা লড়াই করার মতো অক্সিজেন পেয়ে গেছে। বাম-কংগ্রেস জোটও কোমর বেঁধে নামছে। সঙ্গে দোসর আব্বাস-নওসাদের আইএসএফ। এই ত্রিফলা তৃণমূলের সংখ্যালঘু আসনে ভাগ বসালে পথ মসৃণ হবে বিজেপির। পায়ের তলার মাটি যে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে তা টের পাচ্ছে ঘাসফুলের দল।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল গড়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন নেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত পাঁজারাও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। বিজেপির হাত ধরে এনডিএ জোটে শামিল হয়ে রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন মমতা। ২০১১-য় বামফ্রন্টের পতন। তৃণমূলের হাতে রাজ্যের রাশ। দলটার না ছিল নিজস্ব কোনও পার্টি সংবিধান, না ছিল সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা। যে দু'চারজন অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না সুপ্রিমো। তিনি কোনোদিন হয়তো ভাবতেও পারেননি তার দল দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসতে পারে। তাই প্রথম পাঁচ বছরেই লাগামহীন লুটপাট হয়েছে সর্বস্তরে। প্রথম দফাতেই সারদা ও নারদ কেলেঙ্কারি। ২০১৬ তেই তৃণমূলের শিবির উপড়ে যেত। দুর্ভাগ্য সেই সময় রাজ্যের মানুষের কাছে কোনও বিকল্প ছিল না। বিজেপি, বাম, কংগ্রেস কোনও দলেই তেমন কোনও শক্তপোক্ত নেতৃত্ব ছিল না। এই সুযোগটাই নিয়েছে তৃণমূল। তারা ভেবেছিল বিরোধীরা আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু তাদের অদূরদর্শিতা আজ তৃণমূলকে উৎকণ্ঠায় ভোগাচ্ছে। বাঙ্গালির হাতে এখন বিকল্প তৈরি। একুশের নির্বাচনেই তার অ্যাসিড টেস্ট হয়ে গেছে।

রইল কথা ভিন্‌রাজ্যে তৃণমূলের সরকার গড়ার কথা। পেখম লাগিয়ে ময়ূর হওয়ার শখ কাকের চিরকালই থাকবে। তৃণমূল সুপ্রিমো বুঝেছিলেন রাজ্য রাজনীতির রাঘব- বোয়ালদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এঁটে উঠতে পারবে না ভাইপো। তাই তাকে সাংসদ করে ভারতভ্রমণ করাচ্ছেন। আগে তিনি রাজ্য সংগঠনে ভাইপোকে জায়গা করে দিতে গিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ্যদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। উপায় না দেখে অভিষেককে 'তৃণমূল যুবা' খুলে দিয়েছিলেন মমতা। দলের প্যারালাল যুব সংগঠন।

সোমেন মিত্র কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'তৃণমূলের এখন দুটো যুব সংগঠন। একটা কোলাঘাটের এপারে। আরেকটা ওপারে।' গোয়া, মিজোরাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়। একমাত্র মেঘালয় ছাড়া সবকটাতেই নাকের বদলে নরুন নিয়ে ফিরতে হয়েছে তৃণমূলকে। এখন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে দলের কর্মীরাই। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবমূর্তি যে ধোয়া তুলসীপাতা নয়, তা ভালোভাবেই জানেন অভিষেক। তিনি নিজেও কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত। একুশের ভোটপরবর্তী হিংসায় সারা ভারতের কাছে কাছাখোলা হতে হয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকারকে। প্রবাসী বাঙ্গালিদের কাছেও তাদের ইমেজ কালিমালিপ্ত। যে কারণে ২০১৮ সালে আমেরিকার শিকাগোতে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়া হয়নি মমতার। প্রবাসী বাঙ্গালিদের তীব্র বিরোধিতায় অনুষ্ঠান স্থগিত করতে বাধ্য হয় বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি অব শিকাগো। তাই মানরক্ষার খাতিরে নতুন তৃণমূলের অবতারণা।

কাজেই রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাসঙ্গিকতা কোনওকালেই ছিল না। এতদিন ফাঁকামাঠের হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছিল তারা। এরাজ্যে বিরোধীরা তাদের জমি ফিরে পেতেই ক্রমশ বর্ণহীন হচ্ছে ঘাসফুল। ঘেসোজমিতে ইট চাপা দিলে হলুদ হতে হতে একসময় সেই ঘাস মরে যায়। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দুর্নীতির চাপে জোড়াফুলের ঘাসে ক্লোরোসিস ধরেছে। রং হারাতে হারাতে তারাও এখন অবলুপ্তির পথে। ☐

নদীর পাড় ভাঙতে শুরু হয়েছে। নদীর কূলের মানুষ জানেন জলস্রোত বেড়ে গেলে প্রথমে আলগা ঝুরঝুরে মাটির ঢেলা পড়তে থাকে। তারপর ভাঙতে থাকে চাপ চাপ মাটি। মানুষ পাথর ফেলে নেট দিয়ে নদীর পাড় মেরামতের চেষ্টা করে কিন্তু প্রবল জলোচ্ছ্বাস সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মমতাকে টলিয়ে দিয়েছে সাগরদিঘির ঢেউ

সুকল্প চৌধুরী

'তোমাদের তো অনেক দিয়েছি। অঢেল টাকা, ক্ষমতা। তোমাদের লোকেরা ক্রিমিনাল অফেন্স করলে সেভ করা, টোটাল সুযোগ পেয়েছ। তারপরেও কেন তোমরা আমাকে ভোট দেবে না।' সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, সাবিনা ইয়াসমিন, আখরুজ্জামান, গোলাম রব্বানি, জাকির হুসেনকে এই ভাষাতেই ধমক দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাগরদিঘি উপনির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকের শেষে রাজ্যের মুসলমান মন্ত্রীদের নিয়ে অন্য একটি আলোচনাসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহভাজন ববি হাকিম উপস্থিত থাকলেও তাঁকে দলনেত্রী কিছু বলেননি। উপরন্তু এই উপনির্বাচনী ফলাফল নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাথায় ববি হাকিমকে বসিয়ে দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী বেশ রাগত ভাবেই সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে জানিয়ে দেন তার আচরণ খুবই সন্দেহজনক। গ্রন্থাগার মন্ত্রীকে নিজেকে সংশোধন করার কথাও বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়— 'অনেকেই দালালি করছে'। এই বৈঠকে তিনি মুসলমান মন্ত্রীদের জানিয়ে দেন টাকা, ক্ষমতা, সুযোগ সুবিধা যা লাগে দেওয়া হবে। কিন্তু মুসলমান ভোট যেন অন্যদিকে না যায়।

সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচনে হারের পর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে দৃশ্যতই দিশেহারা ক্ষুব্ধ হতাশ তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সকলের উপরেই 'অকাজের ঢেঁকি', 'কাজের নামে অষ্টরম্ভা', 'খালি খেতে পারে' বলে ক্ষোভ জানিয়েছেন। রেগে গিয়ে তিনি জানিয়ে দেন প্রয়োজনে 'সব কটাকে তাড়াবেন'। নবান্ন সূত্রে খবর, এই বৈঠকের পরে এক চিকিৎসককে মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারে ঢুকতে দেখা যায়।

আসলে কেবল সাগরদিঘির উপনির্বাচনে হার নয়, ত্রিপুরায় বস্তা বস্তা নোট খরচ করেও নোটার থেকে কম ভোট পাওয়া, মেঘালয়ে দল ভাঙিয়ে সংগঠন তৈরি করেও সাফল্য না পাওয়া— সব মিলিয়ে প্রত্যাশিত ফলের ধারে কাছে না আসতে পারার হতাশায় চূড়ান্ত দিশেহারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এককভাবে ত্রিপুরায় ও মেঘালয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে এমন টার্গেট তাদের ছিল না। এই দুই রাজ্যে দলীয় প্রার্থীরা সব আসনে জিতলেও এককভাবে ক্ষমতায় আসতে পারতেন না। আসলে তৃণমূল নেত্রীর ধারণা ছিল এই দুই রাজ্যে দশ থেকে বারোটি করে আসন পেলেই তিনি শাসনক্ষমতার নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠবেন। পাশাপাশি ১৬ শতাংশ ভোট ঝুলিতে এলে সর্বভারতীয় দলের তকমাও থেকে যাবে। সকলেই জানেন, মেঘালয় ও ত্রিপুরা দুই রাজ্য বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ঘেরা। মেঘালয়ে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায় আর ত্রিপুরাতে সাম্প্রতিক সময়ে গবাদিপশুর সংখ্যা বেড়েছে।

এর পাশাপাশি অনেকেই বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে ইডি, সিবিআই-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা নজরদারি জোরদার করেছে। ফলে তৃণমূলের পক্ষে আর চাকরি বিক্রির পাশাপাশি গোরু-কয়লা-পাথর ব্যাপক ভাবে চোরাচালান করা সম্ভব হচ্ছে না। বেআইনি ভুয়ো রশিদ ছাপিয়ে পথকর আদায় করা বা মানুষ পাচারও অনেকটাই কমেছে। ফলে এই দলের তহবিল চুপসে আসছে। তার উপর দলীয় খরচ বাড়ছে। গোয়া, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের বিধানসভা নির্বাচনে কম করেও দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ করা, কেষ্টা মণ্ডল-সহ জেলের ভেতরে থাকা দলের বিভিন্ন নেতাদের পেছনে ব্যয় ভার বেড়েছে। এর উপর আছে ভাইপোর চেলাচামুণ্ডা পোষার খরচ। দলের নেতাদের বিলাস ব্যসন তো আছেই। অর্থ জোগান সঠিক রাখতে ভিন রাজ্যের ক্ষমতার শরিক হয়ে ওঠার মরিয়া প্রচেষ্টা ছিল তৃণমূলের।

প্রচেষ্টা থাকা ভালো কিন্তু সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সম্পূর্ণ প্রত্যাখাত রয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে। ত্রিপুরায় প্রচুর ঢক্কানিনাদ করে, প্রায় সাতশো কোটিরও বেশি খরচ করে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে শূন্য, ০.৮৮ শতাংশ ভোট। তবে সান্ত্বনা পুরস্কারও আছে। আরএসপি পেয়েছে ০.৭০ শতাংশ, এছাড়া সিপিআইএমএল ০.০৪ শতাংশ ভোট। সকলেই জানেন ত্রিপুরায় নোটার প্রাপ্ত ভোট ১.৩৬ শতাংশ। ত্রিপুরায় গত পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ২০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ভোট প্রাপ্তির শতাংশের বিচারে পরিষ্কার যে, বিধানসভা নির্বাচনে এই রাজ্যের মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত ও স্বৈরাচারী এই দলকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এবারের নির্বাচনে একমাত্র রামনগর কেন্দ্রে মমতার দলের প্রার্থী প্রায় দু' হাজার ভোট পেয়েছেন। উল্লেখ্য,এই কেন্দ্রে বাম-কংগ্রেস জোট কোনও প্রার্থী দেয়নি। প্রায় সব কেন্দ্রে মমতার দলের জামানত জব্দ হয়েছে। ত্রিপুরাতে শাসক বিজেপি বিরোধী কংগ্রেস বাম বা মথার ভোট প্রাপ্তি তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে কয়েক গুণ বেশি।

মেঘালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা সামান্য ভালো। সেখানে এই দল পেয়েছে ৫টি আসন। প্রায় ১৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে তারা। তবে তৃণমূলের জয়ী বিধায়কেরা দল বদল করে শাসক জোটে শামিল হবেন বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে চমক হলো সাগরদিঘির উপনির্বাচনের ফল। এখানে বাম-কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাসের জয়লাভ তৃণমূল শিবিরে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসনের শেষ দিকে স্ট্যালিনীয় শোষণের হাত থেকে এরাজ্যের মানুষ যখন মুক্তি পেতে চাইছে সেই সময় সবাইকে চমকে দিয়ে বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মদন মিত্র জয়লাভ করেছিল। তখন বিশিষ্ট বাম নেতা সৈফুদ্দিন চৌধুরী সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, সিপিএমের শেষের শুরু হলো। কথাটা মিলে গিয়েছিল। এরপর দ্রুত বামের পতন ও তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান। বলা হয়, সেই সময় কোনও বিকল্প শক্তি না থাকায় বেশিরভাগ ভোটদাতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৩৮ শতাংশ হিন্দু ভোট ঘাসফুলে পড়েছিল। পক্ষান্তরে ১৭ শতাংশ মুসলমান ব্যালট পেপার ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তবে ভোটে জিতেই তিনি মুসলমান তোষণে দেশের সেরা হয়ে ওঠেন। চাকরি, ঋণের সুবিধা, ব্যবসার সুবিধা, অপরাধ করলে চোখ বুজে থাকা, চোরাচালান, অনুপ্রবেশ-সহ সব ধরনের সুযোগ একচেটিয়া ভাবে মুসলমানরা পেয়ে আসছে।

কোনও সন্দেহ নেই ৬৮ শতাংশ মুসলমান ভোটার অধ্যুষিত সাগরদিঘিতে কেন তৃণমূল প্রার্থী পরাজিত হলেন তার অনেক কারণ বিভিন্ন মহল থেকে আলোচিত হচ্ছে। তার একটি হলো এই কেন্দ্রে রাজ্যের শাসক দলের প্রার্থী ছিলেন হিন্দু। তাই দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তিনবারের জেতা আসন ধরে রাখতে পারেননি। এই ধারণা ভুল। কারণ মেরুকরণ থাকলে বিজেপি প্রার্থী এত কম ভোট পেতেন না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সব ধরনের মানুষ শাসক দলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তাই শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও অনেকেই বলছেন একটি মাত্র উপনির্বাচনের ফলাফল দেখে ভবিষ্যতের সরলীকরণ কখনই করা যায় না।

সামনেই আসছে পঞ্চায়েত নির্বাচন, তারপর আগামী বছর লোকসভার ভোট। ২০২৬-এ রাজ্য বিধানসভার ভোট। আগামীদিনে অনেক পরিবর্তন হতে পারে। অনেক নতুন সমীকরণ আসবে হয়তো। বিজেপি অথবা বাম-কংগ্রেস কী কর্মসূচি নেবে তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মানুষের ভাবনা কী হবে, এর পাশাপাশি তৃণমূল নেত্রীর গিমিক বা নাটক কেমন করে 'খাওয়ানো' হবে সবটাই মাথায় রাখা দরকার। ২০২১ -এ পা ভাঙা নাটক, বাংলাদেশের স্লোগান খেলা হবে, এনআরসি, দিদিকে বল, টাকা ছড়ানো, সর্বোপরি ৫০০ টাকা ভিক্ষা ও প্রশাসনের সহায়তায় রোহিঙ্গা আর জেহাদিদের ব্যাপক সন্ত্রাস রাজ্যের মানুষ দেখেছেন। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখেও বলা যায় এবারে কিন্তু নদীর পাড় ভাঙতে শুরু হয়েছে। নদীর কূলের মানুষ জানেন জলস্রোত বেড়ে গেলে প্রথমে আলগা ঝুরঝুরে মাটির ঢেলা পড়তে থাকে। তারপর ভাঙতে থাকে চাপ চাপ মাটি। মানুষ পাথর ফেলে নেট দিয়ে নদীর পাড় মেরামতের চেষ্টা করে কিন্তু প্রবল জলোচ্ছ্বাস সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের পর ত্রিপুরার মানুষ সব থেকে ভালো চেনেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। তাই সেখানে ভোটপ্রাপ্তি শূন্য। অন্যদিকে এই রাজ্যের সাগরদিঘিতে ভোট নেমে এসেছে ৩৪.৯৪ শতাংশে। সবাই জানেন ২০১১ সালে এই কেন্দ্রে শাসক দল পেয়েছিল ৫০ শতাংশ ভোট। পাশাপাশি বিজেপিরও ভোট কমেছে। বিগত নির্বাচনে ছিল দ্বিতীয় স্থান, এবারে তৃতীয়। আসলে এবারের নির্বাচনে এই কেন্দ্রের মুসলমান ভোটাররা শাসক দল বা বিজেপি নয়, কংগ্রেসকেই বিকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তৃণমূলের প্রচুর সমর্থক এবারে ভোট দিয়েছেন বাইরন বিশ্বাসকে। একইভাবে বিজেপি সমর্থক মুসলমান ভোটদাতারাও অধীর চৌধুরীর প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। রাজনৈতিক পরিভাষায় এই ভোটদাতারা ফ্লোটিং ভোটার। তারা কখন কোন দিকে যাবেন বলা কঠিন। বিগত বছর কুড়ি ধরে মুসলমান ভোটদাতারা একচেটিয়া ভাবে তৃণমলের দিকেই ঝুঁকে আছে। বিভিন্ন খাতে মুসলমানদের জন্য রাজ্য বাজেটের প্রায় ২০ শতাংশ ব্যয় করা হয়। এর পাশাপাশি অনুপ্রবেশ, মুসলমান অপরাধীদের প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি তোয়াজের কারণে মুসলমান ভোট একচেটিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মুসলমানদের কাছে পরম ভরসা তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে আজমেঢ় দরগায় তৃণমূল নেত্রী বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছেন। রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা তাকে সেখানে দেওয়া হয়েছে। একই মর্যাদা সেখানে পাক প্রেসিডেন্ট মুসারফকে দেওয়া হয়েছিল।

বিষয় হলো মুসলমান সমর্থন তৃণমূলের দিক থেকে কমতে শুরু হয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে এই বিষয়টি অশনি সংকেত। ঈশানকোণে মেঘ জমতেই দিশেহারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন করে টাকার ঝুলি নিয়ে তিনি মুসলমান তোয়াজে নেমে পড়েছেন। রাজ্যের তো বটেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমান মোল্লা-মৌলবির কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দূত পাঠাতে শুরু করেছেন। সকলেই জানেন এই দূতেরা খালি হাতে যান না। যাই হোক না কেন, মেকি হিজাবে কেউ আর ভুলবে না। এত দুর্নীতি, অপরাধ, খুন, বোমাবাজি, তোলাবাজি সবেরই শেষ আছে। যবনিকার আরম্ভ কিন্তু হয়েছে, শেষ এবার হবেই। □

সূক্ষ্ম হিসাব

একজন লোককে তার বয়স জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সে তক্ষুনি কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসাব করে বলল, ‘ আঠারো বছর তিন মাস ষোলো দিন চার ঘণ্টা— কত মিনিট বলতে পারলাম না।’ যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি তো উত্তর শুনেই চটে লাল। সত্যি আমাদের সকল কাজের যদি এরকম চুলচেরা সূক্ষ্ম হিসেব রাখতে হয় তবে হিসেবের খবর নিতেই সারা জীবনটা কেটে যেত।

মনে করো বাইরে ভয়ানক ঝড় বইছে। একজন বলল, ‘উঃ, ভয়ানক জোরে হাওয়া দিচ্ছে।’ যিনি সূক্ষ্ম হিসেব চান তিনি তক্ষুনি জিজ্ঞেস করবেন, ‘ভয়ানক জোরটা কীরকম জোর? ঘণ্টায় কত মাইল বেগে বাতাস চলছে? একদিকেই যাচ্ছে, না দিক বদলাচ্ছে? কীরকম বাড়ে কমে?’ ইত্যাদি। যাঁরা মেঘ বৃষ্টি বাতাস নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা এরকম সব খবর সংগ্রহ করবার জন্য নানারকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কল ব্যবহার করেন। বাইরে একচোট বৃষ্টি হয়ে গেল। লোকে দেখে বলল, ‘বাসরে, কী ঝমঝম বৃষ্টি।’ কিন্তু আমাদের সূক্ষ্ম হিসেবি পণ্ডিতরা হয়তো বলবেন, ‘ এই বৃষ্টিকে যদি সমানভাবে মাটির উপরে ধরে রাখা যেত তবে ঠিক এক ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি জল দাঁড়াত।

শীত গ্রীষ্ম বোঝাবার জন্য আমরা কতখানি ঠাণ্ডা বা কতখানি গরম তাও ভাষায় কতভাবে বলতে চেষ্টা করি— যেমন, ‘শীতে হাড় জমে গেল; বড্ডো শীত; বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে; একটু যেন গরম; ভয়ানক গ্রীষ্ম; উঃ, গরমে গা ঝলসে গেল’ ইত্যাদি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কাছে যাও, তিনি চট করে বলে দেবেন ‘আর এত ‘ডিগ্রি’ ঠাণ্ডা হলেই বরফের মতো ঠাণ্ডা হবে’ বা ‘ আর এত ‘ডিগ্রি’ গরম বাড়লে ফুটন্ত জলের মতো গরম হবে।’ এক ঘটি ঠাণ্ডা জল রয়েছে। তুমি তাতে এক ফোঁটা গরম জল ফেলে দাও— কোনো তফাত বুঝতে পারবে না। কিন্তু এমন যন্ত্র আছে যা দিয়ে পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা তক্ষুনি বলে দিতে পারবেন, ‘এ জলটা একটু গরম হলো।’ এখান থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে একটা বাতি জ্বেলে রাখো আর এখানে বসে যন্ত্রের মুখ তার দিকে ফিরিয়ে দাও। অমনি দেখবে, কলের মধ্যে সূক্ষ্ম কাঁটা সেই গরমেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

একটা কাগজের ঠোঙায় খানিকটা চাল রয়েছে। তুমি হয়তো দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মেপে বললে ‘ আধসের চাল।’ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কাছে যাও, তিনি তাঁর তুলাদণ্ডে ওজন করে বলবেন, ‘না, ঠিক আধসের হয়নি। আরও প্রায় দেড়খানা চাল দিলে তবে ঠিক আধসের হবে।’

আমরা কথায় বলি ‘চুলচেরা’ হিসেব আর মনে করি চুলকে চিরতে গেলে বুঝি হিসেবটা নিতান্তই সূক্ষ্মরকম হয়। কিন্তু যাঁরা অণুবীক্ষণ নিয়ে কাজ করেন তাঁরা বলবেন ‘চুলটা তো একটা দস্তুরমতো মোটা জিনিস। একটা চুলকে হাজার বার চিরলে তবে বলি — হ্যাঁ, হিসেবটা কতখানি সূক্ষ্ম বটে।’ অণুবীক্ষণের সাহায্যে পণ্ডিতেরা যেসকল সূক্ষ্ম জিনিসের খবর রাখেন, তাদের মধ্যে অনেকগুলি এতই সূক্ষ্ম যে তাদের একটার কাছে একটা ছোটো পিঁপড়ে যেন ছারপোকার পাশে হাতির মতো দেখায়। এক ইঞ্চিকে একশো ভাগ, হাজার ভাগ, লক্ষ ভাগে চিরেও পণ্ডিতদের হিসেবের পক্ষে যথেষ্ট সূক্ষ্ম হয় না। এক চৌবাচ্চা জলের মধ্যে একটা সরষের মতো ছোটো চিনির টুকরো ফেলে দাও। তার এক চামচ জলের মধ্যে যতটুকু চিনি থাকে তার চাইতেও অল্প পরিমাণ জিনিস পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা সেসব জিনিস সম্পর্কে অনেক আশ্চর্য খবর সংগ্রহ করেছেন।

খুব তাড়াতাড়ি ‘কাট’ বলতে কতক্ষণ সময় লাগে? হিসেব করে দেখা গেছে কথাটা শেষ হতে প্রায় এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। একটা জোরে ছোটা ট্রেন ততক্ষণে পাঁচ-ছয় হাত চলে যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের হিসেবের কাছে সময়ের এ-হিসেবটা খুবই মোটা। ট্রেনটা এক চুল পরিমাণ নড়তে যতটুকু সময় লাগে সেটুকু সময়ের মধ্যে যা ঘটেছে বৈজ্ঞানিক তার সন্ধানও রেখে থাকেন। এখানে হঠাৎ একটা আলো জ্বেলে দেখো, আলো ছুটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং তক্ষুনি লোকে বলবে ‘এ আলো জ্বলল’। ‘তক্ষুনি’ বললাম কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলবেন, ‘তক্ষুনি নয়, একটু পরে। ওই অনেক দূরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের কাছে আলো পৌঁছতে কিছু সময় চাই তো।’ যদি জিজ্ঞেস করো ‘কতখানি সময় লাগে’ তিনি বলবেন ‘ট্রেনটা যতক্ষণে একইঞ্চি যাবে, আলো ততক্ষণে কলকাতা থেকে ছুটে মধুপুরে হাজির হবে।

শ্যামল চক্রবর্তী

ভারতের বিপ্লবী

কনকলতা বড়ুয়া

স্বাধীনতা সংগ্রামী কনকলতা বড়ুয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসমের প্রথম বলিদানী মহিলা। ১৯২৪ সালের ২৭ ডিলেম্বর তিনি অসমের গহ অচলের বরঙাবাড়ি গাঁয়ে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিপ্রসার আগরওয়ালার নেতৃত্বে তিনি মৃত্যুবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৪২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ভারত ছাড় আন্দোলনের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে অসম শাখার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিটি থানায় ইংরেজদের ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে তেরঙা পতাকা উত্তোলন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। গহপুরের পশ্চিম দিকে অবস্থি থানা অভিমুখে যাওয়া মৃত্যুবাহিনী সদস্যেদের সামনে হাতে পতাকা নিয়ে মিছিলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় কনকলতা ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জানো কি?

- ভারতের সর্বোচ্চ সামরিক পুরস্কার হলো পরমবীর চক্র।
- অসামরিক সর্বোচ্চ পুরস্কার--- ভারতরত্ন। সাহিত্যে সর্বোচ্চ পুরস্কার— জ্ঞানপীঠ। চলচ্চিত্রে সর্বোচ্চ পুরস্কার— দাদাসাহেব ফালকে। ক্রীড়াক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পুরস্কার— ন্যাশনাল স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড।
- বিজ্ঞানসম্মত মৎস্যচাষকে নীল বিপ্লব বলা হয়।
- অধিক দুধের উৎপাদনকে শ্বেতবিপ্লব বলা হয়।
- অধিক গম উৎপাদনকে সবুজ বিপ্লব বলা হয়।

ভালো কথা

হোলি খেলা

এবার হোলিতে খুব আনন্দ হয়েছে। দাদাদের সঙ্গে আমরা রং খেলতে বেরিয়েছিলাম। সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত রং খেলেছি। জমাদার, চর্মকার, ভ্যানওয়ালা সবাইকে রং লাগিয়েছি। সবাই খুশি হয়ে আমাদের আশীর্বাদ করেছে। তারপর পাড়ার মধ্যে অনেকের বাড়িতে গেছি। বাড়ির সবাই এসে আমাদের সঙ্গে রং খেলেছে। সবাইকে মিষ্টি খাইয়েছে। দুপুরে যখন ভূত হয়ে বাড়িতে ফিরলাম, বাবা প্রথমে চিনতেই পারেনি।

ঋষিকা দাঁ, চতুর্থ শ্রেণী, টিপি রোড, কলকাতা-৬।।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) হা বী ম

(২) লা ক ত

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ক পা মা র বি ণ

(২) পা পা টা টি ল ল

৬ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) উগ্রগন্ধ (২) একমাত্র

৬ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) সমাজসেবামূলক (২) ঠাকুরমহাশয়

উত্তরদাতার নাম

(১) প্রেরণা ভৌমিক, নিউ মার্কেট, গঙ্গারামপুর, দঃ দিনাজপুর। (২) দেবগোপাল দাস, বলাগড়, হুগলী। (৩) অনিক মণ্ডল, খড়িয়প, আমতা, হাওড়া। (৪) শুভম সরদার, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

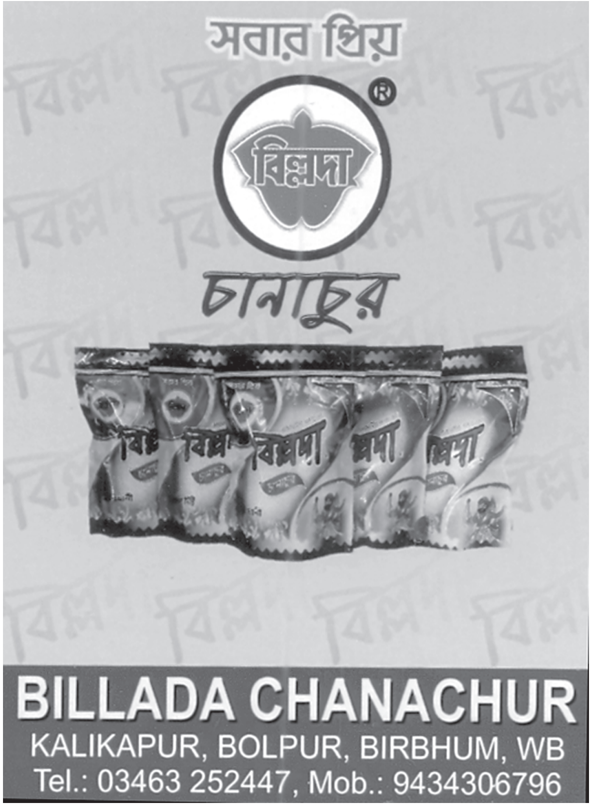

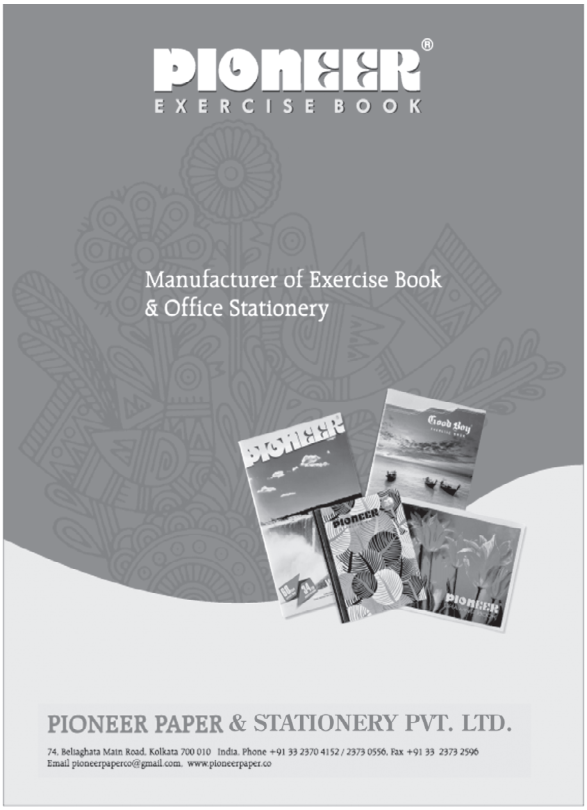

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

মোদী ম্যাজিকে বিরোধীরা কুপোকাত

রামানুজ গোস্বামী

মোদী ম্যাজিক অটুট রইল। সেই সঙ্গে ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়— এই তিন রাজ্যেই ফের একবার সরকার গড়ল বিজেপি। এর মধ্যে নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়— এই দুটি রাজ্যে বিজেপি তাদের পুরাতন জোটসঙ্গীদের (যথাক্রমে এনডিপিপি এবং এনপিপি) সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করল। অন্যদিকে, ত্রিপুরাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। সুতরাং একটা কথা একেবারেই স্পষ্ট যে, উত্তর-পূর্বের এই তিন রাজ্যের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে পুনরায় শামিল হয়েছেন। বস্তুত এটা বলাই বাহুল্য যে, বিগত পাঁচ বছরে এই তিন রাজ্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে অভূতপূর্ব উন্নতি, যা এর আগে ধারণা বা কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। তাই পুরনায় বিজেপির জয়জয়কার ছিল একেবারেই প্রত্যাশিত। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই জয় নিঃসন্দেহেই বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বিজেপির যথোচিত উত্তর, এই কথা বলা যেতেই পারে।

ভারতের শতাব্দী প্রাচীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। এদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। কংগ্রেস যতই বিজেপির বিভিন্ন নীতির বিরোধিতা করুক না কেন, ভারতের জনগণ যে তাতে আর কর্ণপাত করে না, এই নির্বাচন সেই কথাই জানিয়ে দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের এক ক্ষুদ্র আঞ্চলিক দল তৃণমূল কংগ্রেস (যারা নামেই সর্বভারতীয়) ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে নাকি একেবারে সরকার পর্যন্ত গড়ে ফেলবে— এমনটা প্রচার করা হয়েছিল। এই রাজ্যের কতিপয় শাসকপন্থী মিডিয়া তো একেবারে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিল যেন, এই দুই রাজ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পর্যন্ত পেয়েই গিয়েছে তৃণমূল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও কাজের কাজ হলো না কিছুই। মেঘালয়ে তৃণমূল পেয়েছে মাত্র পাঁচটি আসন অর্থাৎ গুরুত্বের দিক থেকে একেবারেই শূন্য আর ত্রিপুরাতে তৃণমূল তো খাতাই খুলতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই দুই রাজ্যে ঢক্কানিনাদে প্রচারাভিযান চালানোর পরেও কাজের কাজ

কিছুই হয়নি। আসলে, তৃণমূল যে আদ্যন্তই একটি ভয়াবহ দুর্নীতিগ্রস্ত দল তা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সারা ভারতের মানুষই অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছেন।

গোরুপাচার, কয়লাপাচার, বালিচুরি, চাকরিচুরি, তোলাবাজি, কাটমানি, এই সবই তৃণমূলের বৈশিষ্ট্য। এই সব বিভিন্ন অপরাধে বর্তমানে যতভাবে সম্ভব, আটকানোর চেষ্টা করেও 'বাংলার বাঘ' অনুব্রত তথা কেষ্ট মণ্ডল বর্তমানে দিল্লিতে ইডির হেফাজতে। তাই নিয়ে এখনও তৃণমূলের বক্তৃতার অন্ত নেই। আসলে, ভারতের কোনো রাজ্যই চায় না যে, এহেন আদ্যন্ত একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দল সেই রাজ্যে ক্ষমতায় আসুক। তাই গোয়া, গুজরাট, ত্রিপুরা, মেঘালয়— সর্বত্রই একই ছবি পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া একটা কথাও বোঝা দরকার।

(ক) শিল্পায়নে এই রাজ্য একেবারে পিছিয়ে। কর্মসংস্থানে শূন্য।

(খ) আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতিও এক ভয়ানক অবস্থায় রয়েছে।

(গ) রাজ্য-সরকারি কর্মচারীরা এই রাজ্যে নিজেদের প্রাপ্য ডিএ ইত্যাদি পান না কিন্তু মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিতে তৃণমূল সবার চেয়ে এগিয়ে।

এই রাজ্যের সাগরদিঘির উপনির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয় আরও এক বার্তা বহন করে এনেছে। মুসলমানদের তৃণমূল ভোটব্যাংক ছাড়া যে আর কিছুই মনে করে না, নওশাদ সিদ্দিকির গ্রেপ্তারি তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ধীরে ধীরে এটা মুসলমান সমাজও বুঝতে পারছে আর তারই পরিণতি তৃণমূলের এই পরাজয়।

সমস্ত দেশ আজ মোদীজীর উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে শামিল হয়ে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের সুফল উপভোগ করছে। পশ্চিমবঙ্গকেও সেটা বুঝতে হবে। অবান্তর প্রাদেশিক রাজনীতির দ্বিধাকে সরিয়ে রেখে নিজেদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে বাঙ্গালিকেও তাই বিজেপির এই জয়যাত্রায় শামিল হতেই হবে। কারণ, 'মোদী হ্যায় তো, মুমকিন হ্যায়'। ◻

ফ ঃ ৬

শীর্ষ আদালতের দ্বিচারিতা

তারক সাহা

গত ২ মার্চ শীর্ষ আদালতের পাঁচ সদ্যসের বেঞ্চ দেশের নির্বচনী প্রক্রিয়াকে নিষ্কলুষ রাখার জন্য বিরোধীদের একাধিক আপিলের শুনানির পর যে রায় দেয় তাতে বলা হয়েছে যে, সরকার এরপর থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার সরাসরি নিযুক্ত করতে পারবে না।

স্বাধীনতার সাত দশক পেরিয়ে গেলেও এতদিন সরকারই তা নিযুক্ত করে এসেছে। গত শতকের আশির দশকের শেষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সরকার আমলা টি এন শেষণকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করে। শেষণের আগে নির্বাচন কমিশনার কী বস্তু তা লোকের ধারণা ছিল না। ভারতের ইতিহাসে শেষণ অমর হয়ে আছেন নির্বাচনী সংস্কারক রূপে। তিনিই প্রথম নির্বাচন কমিশনার যিনি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আমূল সংস্কারসাধন করে নির্বাচকমণ্ডলীর সচিত্র পরিচয়পত্রের প্রবর্তন করেন। এজন্য দেশের স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁর বিরুদ্ধে একরকম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

বিরূপ সমালোচনা, বিদ্রূপ, আন্দোলন কিছুই দমাতে পারেনি শেষণকে। তিনি সরকারকে একপ্রকার বাধ্য করেছিলেন সচিত্র পরিচয়পত্র প্রণয়নে। এতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছিল নির্বাচনী প্রক্রিয়ায়। এর আগে দেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নামে চলত প্রহসন। ব্যাপক ব্যালট লুঠ আর ছাপ্পাভোট চলত।

ভোটার পরিচয়পত্র এই প্রহসনকে অনেকটা দমন করেছিল। সাধারণ ভোটাররা এরপর থেকে অনেকটা নির্ভয়ে ভোট দিতে পারছে। সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্বাচন কমিশনের কী ক্ষমতা তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন শেষণ। অনেক রুষ্ট রাজনৈতিক নেতাকে তাঁকে পাগল বলতে শোনা গেছে। শেষণের ভোটার পরিচয়পত্রের ধারণা

থেকেই শুরু হয় সচিত্র প্যান কার্ড এবং সচিত্র আধার কার্ড। ভোটার কার্ড প্রবর্তন করতে গিয়ে শেষণ খানিকটা কঠোর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি যেমন সাধারণ ভোটারদের বন্ধু হয়ে গেছিলেন, তেমনই স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের ঘোরতর শত্রুতেও পরিণত হয়েছিলেন। এরকম এক নীতিনিষ্ঠ মানুষকে লাগাম পরাতে অন্য দুই কমিশনার নিয়োগ। যদিও সংবিধানে এর মান্যতা রয়েছে। স্বাধীনতার বহু দশক পেরিয়ে গেলেও রাজনৈতিক নেতাদের মনে আসেনি দুজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কথা। শেষণের মতো একজন কড়া নির্বাচন কমিশনের উদয় হতেই, আর তাতে স্বার্থান্বেষী নেতাদের স্বার্থে আঘাত লাগতেই দুজন নির্বাচন কমিশনার পদের সৃষ্টি।

ধীরে ধীরে যখন ভারতীয় জনতা পার্টির গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকল আর প্রায় সব রাজ্যেই তারা ক্ষমতাসীন হলো তখন হতাশ রাজনৈতিক বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। জনবিচ্ছিন্ন নেতারা ভাবছেন, নির্বাচন কমিশনারের হাতেই যেন রয়েছে তাঁদের মরণকাঠি । তাই নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ প্রক্রিয়া সরকারের হাত থেকে কেড়ে নিতে তাঁরা দেশের শীর্ষ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি জোসেফ নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ নিদান দিয়েছে— সংসদে আইন তৈরি না হলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং দুই কমিশনারের নিযুক্তি হবে তিন সদস্যের কলেজিয়াম মারফত--- এতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী নেতা এবং শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি। বেঞ্চের মতে, যেহেতু নির্বাচন কমিশনারদের বেতন-সহ প্রদেয় ভাতাদি সরকার বহন করে, তাই তাঁদের আনুগত্যও সরকারের ওপর থাকে । এখন থেকে এদের ভাতা দিতে হবে consolidated fund of India থেকে। বেঞ্চের মতে, এতে নাকি নির্বাচন কমিশনার পক্ষপাতদুষ্ট হবেন না।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আদালতের সিদ্ধান্তে দুটি গরমিল দেখা গেছে। প্রথমত, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি নিয়োগকর্তাদের (এখানে প্রধানমন্ত্রী) একজন থাকতে পারেন, তবে শীর্ষ আদালত বা রাজ্যের উচ্চ আদালতের বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের একজন কেন থাকবেন না কলেজিয়ামে? এটাকে Judicial Dictatorship বললে ভুল হবে? দ্বিতীয়ত, যে-কোনো নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের (এখানে সরকার) কোনো বক্তব্য থাকবে না? নির্বাচন কমিশনার ও শীর্ষ আদালতের বিচারকদের পদ সাংবিধানিক এবং নিযুক্তরা রাজকর্মচারী। তবে দুই পদের নিয়োগ পদ্ধতিতে এমন দ্বিচারিতা কেন? মনে রাখতে হবে আইনের সেই চিরায়ত বাণী— 'one can't be judged for one's cause'। আর বিচারপতিরা এটাই করছেন তাদের নিয়োগের ব্যাপারে। □

মেয়েদের আইপিএলে বাঙ্গালিরা সামনের সারিতে

নিলয় সামন্ত

ছেলেদের আইপিএল নিয়ে ঠিক যেমনটা মাতামাতি হয়, এবার থেকে মেয়েদের আইপিএল নিয়েও তেমনই করার ইচ্ছে ছিল বিসিসিআইয়ের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো। আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল। মেয়েদের আইপিএল শুরু হলো ৪ মার্চ থেকে। তার আগে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এই টুর্নামেন্ট শেষ হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি। মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয়ে গেল মেয়েদের আইপিএল। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে অরুণ ধুমাল বলেছিলেন, 'উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ ৪-২৬ মার্চ অবধি মুম্বাইতে হবে।'

মেয়েদের আইপিএলের ভেনু হিসেবে মুম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম ও ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়াম দুটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এখানেই হচ্ছে মেয়েদের সবক'টি ম্যাচ। মেয়েদের আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় গুজরাট জায়ান্টস এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। ১৩ ফেব্রুয়ারি হওয়া মহিলাদের আইপিএলের উদ্বোধনী সংস্করণের নিলামে মোট পাঁচটি শহরের মেয়েদের ডব্লিউপিএলে খেলা স্থির হয়। ১২৮৯ কোটি টাকা দিয়ে মেয়েদের আইপিএলে দল কিনেছে আদানি। ইন্ডিয়াউইন স্পোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড ৯১২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকায় মুম্বাই দলটি কিনেছে। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়াল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ৯০১ কোটি টাকা দিয়ে একটি দল কিনেছে। মহিলা আইপিএলে ৮১০ কোটি টাকা দিয়ে দল কিনেছে জেএসডব্লিউ জিএমআর ক্রিকেটও। এছাড়া মেয়েদের আইপিএলের উদ্বোধনী সংস্করণের পঞ্চম দলটি কিনেছে কাপ্রি গ্লোবাল হোল্ডিংস। তারা ৭৫৭ কোটি টাকায় লখনউয়ের দলটি কিনেছে।

প্লেয়ারদের কেনার জন্য প্রত্যেক দলের কাছে ১২ কোটি করে টাকা ছিল। প্রথমে ঠিক হয় একটি দল কমপক্ষে ১৫ জন ক্রিকেটার কিনতে পারবে। পরে সর্বাধিক ১৮ জন ক্রিকেটার রাখার নিয়ম করা হয়। যার মধ্যে পাঁচজন বিদেশি থাকতে হবে। এবং আইসিসির সহযোগী দেশগুলির ক্রিকেট টিম থেকে এক সদস্যকে দলে রাখতে হবে। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে হবে মোট ২২টি ম্যাচ। এবারই প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাওয়া ডব্লিউপিএলের নিলামে ১৫টি দেশ থেকে মোট ৪০৯ জন ক্রিকেটার অংশ নিয়েছে। বিসিসিআই জানিয়েছে, এই নিলামে অংশ নিতে ১ হাজার ৫২৫ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। বাছাইয়ের পর নিলাম তালিকায় জায়গা পেয়েছেন ২৪৬ জন ভারতীয় ক্রিকেটার এবং ভারতের বাইরে থেকে

আরও ১৬৩ জন ক্রিকেটার । এর মধ্যে আইসিসির সহযোগী দেশের ক্রিকেটার আছেন ৮ জন।

এই টুর্নামেন্ট বাণিজ্যিকভাবে সফল করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না ক্রিকেটকর্তারা। ৯৫১ কোটি টাকার বিনিময়ে পাঁচ বছরের জন্য (২০২৩ থেকে ২০২৭) প্রতিযোগিতার সম্প্রচার সত্ব পেয়েছে ভায়াকম ১৮। অর্থাৎ ম্যাচ প্রতি ৭ কোটি ৯ লক্ষ টাকা দাম দিয়েছে তারা। ২০০৮ সালে শুরু হয়েছে ছেলেদের ২০ ওভারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। সেই ধাঁচেই মেয়েদের নিয়ে শুরু হলো উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ। মেয়েদের এই আইপিএলে বাঙ্গালি মেয়েরা ছাপিয়ে গেলেন ছেলেদের। সংখ্যার বিচারে ছেলেদের আইপিএলের থেকে মেয়েদের আইপিএলে বাঙ্গালি অনেক বেশি।

ছেলেদের আইপিএল শুরু হবে মার্চের ৩১ তারিখ থেকে। সেই প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলার ক্রিকেটার হিসেবে থাকছেন শাহবাজ আহমেদ, আকাশদীপ ও মুকেশ কুমার। কিন্তু এরা কেউই বাঙ্গালি নন। আইপিএলে বাঙ্গালি বলতে একমাত্র ঋদ্ধিমান সাহা। গুজরাট টাইটানস দলে রয়েছেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে ত্রিপুরা পাড়ি দিয়েছেন ঋদ্ধি। এ বারের রঞ্জি খেলেছেন ত্রিপুরার হয়েই। পশ্চিমবঙ্গে ফিরবেন বলে আর মনে হয় না। কিন্তু ছেলেদের আইপিএলে বাঙ্গালির প্রতিনিধি এখন তিনি একাই। বাংলাদেশের দুই বাঙ্গালি যদিও ছেলেদের আইপিএলে খেলবেন। লিটন দাশ ও শাকিব-আল-হাসান রয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে।

মেয়েদের আইপিএলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালির সংখ্যা বেশি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরে রয়েছেন রিচা ঘোষ। তাঁকে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় কিনেছে আরসিবি। আইসিসি র‍্যাংকিঙে রিচা এক লাফে ২১ ধাপ উঠে এসছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপও জিতেছেন তিনি। ছোটদের সেই দলে ছিলেন তিতাস সাধুও। দিল্লি ক্যাপিটালসে দেখা যাবে তাঁকে। তিতাসকে ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছে দিল্লি। পশ্চিমবঙ্গের অপর্ণা মণ্ডলও রয়েছেন সেই দলে। এছাড়াও রয়েছে ধারা গুজ্জর ও সাইকা ইশাক। তাঁদের দুজনেরই জন্ম পশ্চিমবঙ্গে। দুজনকেই নিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। বাঙ্গলার হয়ে খেলা দীপ্তি শর্মা খেলছেন উত্তর প্রদেশ ওয়ারিয়ার্সের হয়ে। তিনি যদিও বাঙ্গালি নন।

শুধু খেলোয়াড় নয়, কোচও রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। মুম্বাই ইন্ডিয়ান দলের কোচ ঝুলন গোস্বামী। মেয়েদের ক্রিকেটে বাঙ্গলার সব থেকে বড়ো নাম তিনিই। সদ্য অবসর নিয়েছেন ঝুলন। খেলা ছেড়ে কোচ ও মেন্টরের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বোলিং বিভাগকে তৈরি করার দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই। বাঙ্গালির সংখ্যা আইপিএলের শুরুতে এত কম ছিল না। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অধিনায়ক। ক্রিকেটে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো প্রতিনিধি ২০০৮ সালের আইপিএলে প্রথম ম্যাচে টস করেছিলেন। শুধু কেকেআর নয়,পুণে সুপারজায়ান্টসের হয়েও খেলেছিলেন তিনি। যদিও সৌরভের হাতে কখনও আইপিএল ট্রফি ওঠেনি। এখন তিনি দিল্লি ক্যাপিটালস দলের মেন্টর। সেইসময় অশোক দিন্দা, মনোজ তিওয়ারি, লক্ষ্মীরতন শুক্ল, দেবব্রত দাস, ঋদ্ধিমান সাহারা খেলেছিলেন। খেলেছেন শ্রীবৎস গোস্বামী। বেঙ্গালুরু দলে ছিলেন তিনি। এঁদের মধ্যে আইপিএল জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন একমাত্র মনোজ। ২০১২ সালে কলকাতার হয়ে ট্রফি জেতেন তিনি।

পরবর্তীকালে প্রদীপ্ত প্রামাণিক সুযোগ পেয়েছিলেন বেঙ্গালুরু দলে। যদিও ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর। ছেলেদের আইপিএলে গতবার বাঙ্গালির সংখ্যা এবারের থেকে একটু বেশি ছিল। ঈশান পোড়েল ও ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় ছিলেন পঞ্জাব কিংস দলে। ম্যাচ খেলা হয়নি তাঁদের। এবার নিলামের আগে তাঁদের ছেড়ে দিয়েছে পঞ্জাব। এর ফলে এখন ছেলেদের আইপিএলে বাঙ্গালির সংখ্যা ১-এ এসে ঠেকেছে। টি-টোয়েন্টি র‍্যাংকিঙে বিরাট উন্নতি রিচা ঘোষের। আইসিসি'র টি-টোয়েন্টি ক্রমতালিকায় রিচা এখন ২২ নম্বর স্থানে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভালো খেলার পুরস্কার পেলেন তিনি। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতকে ট্রফি জিতিয়েছেন রিচা। সিনিয়রদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ধারাবাহিকভাবে রান করেছেন। আইসিসি ওই প্রতিযোগিতার সেরা দল বেছে নিয়েছিল। সেই দলে একমাত্র ভারতীয় রিচা। পুরো প্রতিযোগিতায় ১৩৬ রান করেছেন তিনি। রিচা ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। পাকিস্তান (৩১), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৪৪), এবং ইংল্যান্ডের(৪৭) বিরুদ্ধে অপরাজিত ছিলেন রিচা। প্রতিযোগিতায় তাঁর গড় ৬৮। ১৯ বছরের রিচার জন্ম শিলিগুড়িতে। সেখান থেকে উঠে আসা উইকেট রক্ষক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজের ভালো পারফরম্যান্সের মাধ্যমে সমর্থকদের মন জয় করে নিয়েছে।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে মেয়েদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার তাহলিয়া ম্যাকগ্রা। দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি। প্রথম দশে একমাত্র ভারতীয় স্মৃতি মান্ধানা। তিন নম্বরে রয়েছেন স্মৃতি। বোলারদের মধ্যে প্রথম দশে রয়েছেন দীপ্তি শর্মা ও রেণুকা সিংহ। পঞ্চম স্থানে দীপ্তি এবং নবম স্থানে রেণুকা। এই তালিকায় শীর্ষে ইংল্যান্ডের সোফি একলেস্টন। অলরাউন্ডারদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে এক নম্বরে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাসলে গার্ডনার। এই তালিকায় একমাত্র ভারতীয় দীপ্তি। তিনি রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। ▫

৯ মাসে ৩০ হাজার অমৃত সরোবরের নির্মাণে প্রান্তিক এলাকায় মিটেছে জলের অভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য ভারত সরকার ‘ক্যাচ দ্য রেইন’ প্রকল্পের সূচনা করেছে। আগামীদিনে সারা পৃথিবীতে জল সংকট দেখা দিতে পারে। সেই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েই অমৃত সরোবর প্রকল্প চালু করেছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। সেই

লক্ষ্যে দেশ ৯ মাসে ৩০ হাজার অমৃত সরোবর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। এটি ‘লক্ষ্য নির্দিষ্ট উন্নয়ন’-এর একটি আদর্শ উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের ২৪ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের অংশ হিসেবে অমৃত সরোবর প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। ‘মিশন অমৃত সরোবর’ গ্রামাঞ্চলে জলের সংকট দূরীকরণ এবং জল সংরক্ষণের প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল। ২০২৩ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ৫০ হাজার অমৃত সরোবর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যার মধ্যে ইতিমধ্যে ৬০ শতাংশ কাজ সাফল্যের সঙ্গে হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকা চিহ্নিত করে সরোবর দূষণমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তারপর জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে চারপাশে নিম, অশ্বত্থ, বটগাছ লাগানো হয়।

মিশন অমৃত সরোবরের অংশ হিসেবে প্রতিটি জেলায় ৭৫টি অমৃত সরোবর তৈরি করা হবে। গত ৫ জানুয়ারি সারা দেশে ৯৩, ১১২টি এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছিল। বর্তমানে ৫০ হাজারেরও বেশি হ্রদ নির্মাণাধীন রয়েছে।

ভারতের ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি সারা দেশে ৫৪৮টি অমৃত সরোবর নির্মাণে সম্মত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে জলের অভাব আছে, সেখানে অমৃত সরোবর প্রকল্প জলের অভাব দূর করবে। জীবনজীবিকা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে। তার সঙ্গে সেচের কাজেও সুবিধা হবে।

হোয়াটসঅ্যাপে অনলাইন খাবারের পরিষেবা চালু ভারতীয় রেলের

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ এবার হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেই ট্রেনে অনলাইন খাবারের অর্ডার দিতে পারবেন রেলযাত্রীরা। এই পরিষেবা চালু করেছে ভারতীয় রেল। প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট কয়েকটি ট্রেন এবং যাত্রীদের জন্যই চালু হচ্ছে রেলের এই ই-ক্যাটারিং পরিষেবা। যাত্রীরা কেমন প্রতিক্রিয়া দেন, তাঁরা কীভাবে বিষয়টি গ্রহণ করেন, সেই ফিডব্যাকের ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে অন্যান্য ট্রেনেও খাবারের অনলাইন পরিষেবা চালু করা হবে বলে জানিয়েছে রেল।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় রেলের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ৯১-৮৭৫০০০১৩২৩ নম্বরে একটি হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস অ্যাকাউন্ট চালু করেছে রেল। প্রাথমিকভাবে দুটো ধাপে পুরো বিষয়টি রূপায়ণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে,

প্রথম ধাপে যে যাত্রীরা অনলাইনে টিকিট কাটবেন তাঁদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস অ্যাকাউন্ট থেকে মেসেজ আসবে। সেখানে অপশনের মাধ্যমে ট্রেনের যাত্রাপথে নিজের পছন্দের রেস্তোরাঁ থেকে, নিজের পছন্দের খাবার অর্ডার করতে পারবেন যাত্রীরা। তার জন্য তাঁদের কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে না। আইআরসিটিসি’র ই-ক্যাটারিং ওয়েবসাইট থেকেই কাজটা করা যাবে। পরবর্তীকালে খাবার বুকিঙের ক্ষেত্রে ‘এআই চ্যাটবট’ ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে রেল। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় ধাপে যাত্রীদের ই-ক্যাটারিং পরিষেবা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবে এই চ্যাটবট। তাদের জন্য খাবারের বুকিঙেও সাহায্য করবে।

আপাতত হোয়াটসঅ্যাপে খাবার বুক করার এই পরিষেবা সব ট্রেনে পাওয়া যাবে না। পরীক্ষামূলকভাবে নির্দিষ্ট কয়েকটি ট্রেনেই পাওয়া যাবে রেলের এই অনলাইন খাবার অর্ডার করার সুবিধা। আইআরসিটিসি তাদের ই-ক্যাটারিং পোর্টাল, ফুড অন ট্র্যাক ওয়েবসাইট www.catering.irctc.co.in-এর মাধ্যমে চালু করেছে। বর্তমানে এই পরিষেবাগুলির মাধ্যমে প্রায় ৫০ হাজার প্লেট খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে।

রেকর্ড পরিমাণ আখ উৎপাদন ভারতে

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ ২০২১-২২ মরশুমে দেশে ব্যাপক হারে আখ উৎপাদন হয়েছে। সম্প্রতি খাদ্য ও জনবণ্টন মন্ত্রকের প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, ওই মরশুমে ৫০০০ লক্ষ টনের বেশি আখের ফলন হয়েছে। তার মধ্যে চিনিকলগুলিতে গিয়েছে ৩৫৭৪ লক্ষ টন। তার থেকে প্রায় ৩৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন হয়েছে। তার থেকে আবার ৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি ইথালন উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

২০২১-২২সালে দেশের চিনি সেক্টর দুর্দান্ত ফল করেছে। ওই মরশুমে আখ এবং চিনি উৎপাদন, চিনি রপ্তানি, আখ সংগ্রহ ও ইথানল তৈরিতে নতুন রেকর্ড গড়েছে দেশ। বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম চিনি উৎপাদনকারী দেশ হলো ভারত।

একসময় চিনির দাম কমে যাওয়ায় কারখানাগুলির ক্ষতি রুখতে ২০১৮ সালের জুন মাসে চিনির ন্যূনতম বিক্রয়মূল্য ২৯ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম নির্ধারণ করে কেন্দ্র। পরবর্তীতে তা সংশোধিত হয়। ২০১৯ সালের

ফেব্রুয়ারিতে প্রতি কিলোগ্রাম চিনির এমএসপি ৩১ টাকা নির্ধারণ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার সময়মতো হস্তক্ষেপ করায় চিনি শিল্পক্ষেত্রকে আর্থিক সংকট থেকে বের করে ধাপে ধাপে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

চিনি শিল্পক্ষেত্রে গতি আনতে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার চিনিকলগুলিকে ইথানল উৎপাদনে উৎসাহিত করছে। পাশাপাশি উদ্বৃত্ত চিনি রপ্তানিতে সাহায্য করা হচ্ছে। এর ফলে কৃষকদের বকেয়া সময়মতো মেটানো সম্ভব হবে। তাছাড়া মিলগুলিও তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করবে। উল্লেখযোগ্য ২০২১-২২ সালে ইথানল বিক্রি করে চিনিকলগুলি ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি উপার্জন করেছে।

উত্তর প্রদেশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী সম্মেলন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ গত ১০ ফেব্রুয়ারি লখনউয়ে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী শীর্ষ সম্মেলন উদ্বোধন করেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ সংস্থাগুলি রাজ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভাদোহি ও বারাণসীর রেশম উত্তরপ্রদেশকে বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। বর্তমানে দেশের উৎপাদিত মোবাইল ফোনের ৬০ শতাংশই উত্তর প্রদেশে তৈরি হচ্ছে। দেশের দুটি প্রতিরক্ষা করিডোরের একটি তৈরি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশেই। সম্মেলনে উপস্থিত বিনিয়োগকারীদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে উৎপাদন-ভিত্তিক উৎসাহ প্রকল্পের কথা জানান প্রধানমন্ত্রী।

সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রাজ্যে নতুন করে ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের কথা জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "উত্তরপ্রদেশ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং সমৃদ্ধিশালী ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও রাজ্যটি অতীতে অনুন্নত ছিল। সেই উত্তরপ্রদেশে আজ বিদ্যুৎ থেকে পরিবহণ সংযোগ—প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই উত্তরপ্রদেশ দেশের একমাত্র রাজ্য হিসেবে পরিচিত হবে যেখানে পাঁচটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থাকবে। উত্তরপ্রদেশে সহজে ব্যবসা করার বিষয়ে সরকারের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যে সুপ্রসাশন, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি, শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়েছে।"

সম্মেলনে আন্তর্জাতিক স্তরের নীতি প্রণয়নকারী, শিল্পপতি, শিক্ষাজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একযোগে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানান, স্টার্ট আপ উদ্যোগে আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে উত্তরপ্রদেশ। আগামী দিনে উত্তরপ্রদেশ সরকার ১০০টি ইনকিউবেটর এবং তিনটি অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে বলে ঘোষণা করেন তিনি।

অস্কার জয় করলেন বঙ্গতনয়া সঞ্চারী

সংবাদ সংস্থা ॥ লস অ্যাঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত ৯৫ তম আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড স্পর্শ করে স্বপ্ন সত্যি করলেন কলকাতার মেয়ে সঞ্চারী দাস মল্লিক। অস্কারের মঞ্চে ডকুমেন্টরি শর্ট বিভাগে সেরার শিরোপা জিতে নেওয়া 'দি এলিফ্যান্ট হুইসপারার্স' তথ্যচিত্রটির সম্পাদনা বিভাগ সামলেছেন সঞ্চারী।

সত্যজিৎ রায়ের পর তিনিই দ্বিতীয় বাঙ্গালি যিনি অস্কার পেলেন।

আরেক বাঙ্গালি ছেলের হাতে অস্কার ওঠার প্রত্যাশায় বুক বেঁধেছিল বাঙ্গালি। কিন্তু সৌনক সেনের 'অল দ্যাট ব্রিদস' শেষ পর্যায়ের লড়াইয়ে হেরে যায়। অস্কার জেতে কেতকী গনসালভিস পরিচালিত ও গুণীত মোঙ্গা প্রযোজিত 'দি এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স'। অস্কার পাওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত সঞ্চারী বলেন, "এখনও একটা ঘোরের মধ্যে আছি। ছবিটা তৈরির সময় পুরো টিম দারুণ পরিশ্রম করেছে। আমরা আমাদের সেরাটা দিয়ে ছবিটা বানাতে চেয়েছি। অস্কারের মতো স্বীকৃতি আমার উৎসাহ হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সে রাতে সারারাত ঘুম আসেনি।"

সঞ্চারীর মা শুভা দাস মল্লিকও একজন ফিল্ম নির্মাতা। মেয়ের গর্বে তিনি গর্বিত। ছোটো থেকে অন্য শহরে থাকলেও ক্লাস নাইন থেকে কলেজ পর্যন্ত কলকাতাতেই পড়াশোনা করেছেন সঞ্চারী। তার পর পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউট। এখন তিনি মুম্বাই নিবাসী। তিনি জানান, "এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স তথ্যচিত্রটি প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলে। এখানে প্রকৃতি মানে মানুষ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত লিভিং কম্পোনেন্টকে সাবজেক্ট করা হয়েছে। একটি হস্তিশাবক যখন ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে তার ভাববিনিময় এই ছবিটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাকিটা অবশ্যই আপনাদের দেখতে হবে।" দক্ষিণ ভারতীয় ঘরানায় তৈরি এ ছবি ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বের মন জয় করেছে।

৯৫ তম আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমিক অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে দ্বিতীয় অস্কার পেয়েছে অরিজিনাল সং বিভাগে এসএস রাজামৌলি পরিচালিত 'আরআরআর' ছবির জনপ্রিয় গান 'নাটু নাটু'। গানটির সংগীত পরিচালক এমএম কিরাভানি এবং গীতিকার চন্দ্রবোস। এবারের অস্কার দৌড়ে তিনটি ভারতীয় ছবি মনোনয়ন পেয়েছিল। প্রথমটি ডকুমেন্টরি শর্টফিল্ম 'দি এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স', দ্বিতীয়টি ডকুমেন্টরি ফিচার 'অল দ্যাটস ব্রিদ' এবং তৃতীয়টি অরিজিনাল সং বিভাগে 'আরআরআর' ছবির জনপ্রিয় গান 'নাটু নাটু'। তিনটি মনোনয়নের মধ্যে দুটিতে অস্কার জয় করেছে ভারতীয়রা। ৯৫ তম অস্কারের মঞ্চে ভারতের সাকসেস রেট ৬৬.৬ শতাংশ। একই দিনে দুটি বিভাগে দুটি ভারতীয় ছবির অস্কার সাফল্য নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা— বলেন, অস্কারবিজয়ী পরিচালক এসএস রাজামৌলি। 'নাটু নাটু' গানটি আগেই 'বেস্ট অরিজিনাল স্কোর' হিসেবে গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার পেয়েছিল।

এর আগে কোনও ভারতীয় ছবির ভাগ্যেই অস্কার জোটেনি। ২০০৯-এ রেসুল পুকুট্টি, গুলজার এবং এ আর রহমান অস্কার পেয়েছিলেন 'স্লামডগ মিলিয়নেয়ার'-এর জন্য, যা ভারতীয় ছবি ছিল না। ব্রিটিশ ছবি 'গান্ধী'র জন্য সেরা কস্টিউম বিভাগে অস্কার পেয়েছিলেন ভানু আথাইয়া। সত্যজিৎ রায় পেয়েছিলেন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড। সেই নিরিখে আরআরআর-এর নাটু নাটু গান এবং দি এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্সের অস্কার বিজয় সম্পূর্ণ দেশীয় ঘরানার এবং দুটিই দক্ষিণ ভারতীয়। অস্কারের মঞ্চে ভারতীয় ছবির সাফল্যের দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে বলেন, 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স-এর টিমকে অভিনন্দন। 'নাটু নাটু'র প্রভাব বিশ্বজনীন, এই গান বহুদিন মনে থাকবে।' □

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৩৬।।

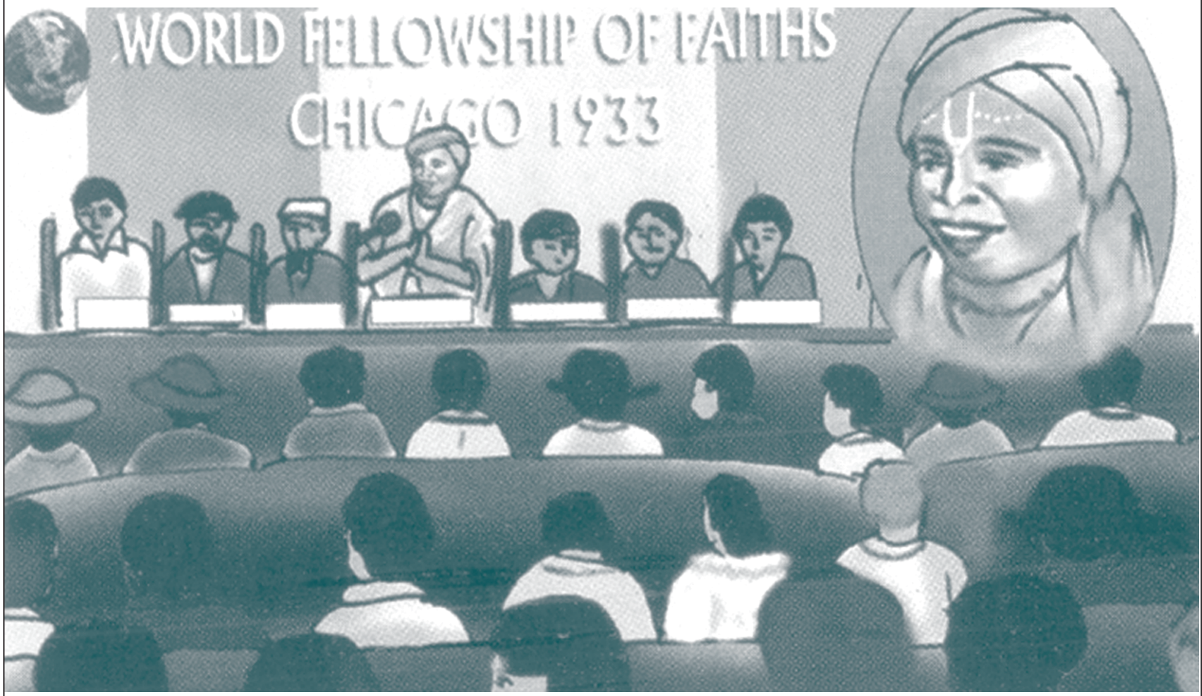

মহানামব্রত শুনলেন, আলোচনা সভা ১৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিনিধি এসেছেন ১৯৯ জন। ভাষণ দেওয়া হবে ২৪২টি। ১২ নং বিভাগে আছেন তিনি। সেখানে বক্তা আছেন এগারো জন।

২ অক্টোবর মহানামব্রতজী প্রথম ভাষণ দিলেন। মোট চারটি বিষয়ের ওপর তাঁর ভাষণ ছিল। (১) অহিংসা, (২) মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, (৩) প্রভু জগদ্বন্ধু, (৪) হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু। প্রথম দিনের ভাষণেই তিনি আমেরিকাবাসীদের মন জয় করে নিলেন। বিবেকানন্দ ও অন্যান্য জ্ঞানতপস্বীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তিনি।

(ক্রমশ)